দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।। ৮ ফাল্গুন - ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

রাহুর গ্রাসে কলেজ স্ট্রিট

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ৮ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২১ ফেব্রুয়ারি - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

মমতার তৃণমূল 'কেউ পদবাচ্য' নয় কেন?

□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

ভাইপো ভাইরাস □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

আমাদের সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না □ চেতন ভগত □ ৮

কোয়াড সম্মেলনে কঠোর নিন্দা চীনের আধিপত্যবাদের

□ বিশ্বামিত্র □ ১০

হিন্দুত্বে কালিমালেপন এখনকার ইন্টেলেকচুয়াল ট্রেন্ড

□ নিখিল চিত্রকর □ ১১

অখিলেশ যাদবের সমর্থনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট প্রচার

□ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৩

বীর সাভারকর ছিলেন অখণ্ড ভারতের সাধক

□ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৫

সংগীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রপতন □ শ্যামল পাল □ ১৮

ইংলিশ মিডিয়াম বাঙ্গালির ভিড়ে কোণঠাসা কলেজ স্ট্রিট

□ সুজিত রায় □ ২৩

কয়েকজন প্রকাশকের জন্য ক্ষতি হয় বেশিরভাগের

□ তুষারকান্তি প্রামাণিক □ ২৫

বইপাড়ার অর্থনীতিতে কোভিড মহামারী আমাদের মাতৃভাষাকে সংকটগ্রস্ত করেছে □ অভিমন্যু গুহ □ ২৭

মাসমণ্ডলের ব্রত □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩১

মহাদেবের চোখের জলে কাটাসরাজ □ সন্তোষ সরকার □ ৩৩

দক্ষিণী প্রতিভার ত্রিবেণী সঙ্গম □ কৌশিক রায় □ ৩৪

আধ্যাত্মিকতার আলোকে বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দর্শন তত্ত্ব □ দীপক খাঁ □ ৩৫

জেনারেল কারিয়াপ্পা □ ৪৩

ধন্য হে ঋষিবর --- রাষ্ট্র তপস্বী মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী) □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ৪৪

ভারতীয় হওয়াই অগ্রাধিকার, পোশাকে নয়

□ শিতাংশু গুহ □ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮-৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভব্য কাশী দিব্য কাশী

বারাণসী ফিরে পেয়েছে তার স্বাভাবিক রূপ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কথা দিয়েছিলেন বারাণসীর অধীশ্বর বিশ্বনাথকে রাজনীতির ঘোলা জল থেকে মুক্ত করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করবেন। তা তিনি করতে পেরেছেন। এখন গঙ্গার ঘাট থেকে সরাসরি মন্দির প্রাঙ্গণ দেখা যায়, ঠিক যেমনটা আগে যেত। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় ভব্য কাশী, দিব্য কাশী। লিখবেন— নন্দলাল ভট্টাচার্য, অভিষেক গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ আবেদন

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পাঠানো সত্ত্বেও ডাকযোগে বহু গ্রাহকই স্বস্তিকা ঠিকমতো পাচ্ছেন না— এরকম অভিযোগ আমরা হামেশাই পাচ্ছি। এবিষয়ে ডাকবিভাগে যোগাযোগ করেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই, আমরা রেজিস্ট্রি পোস্টের মাধ্যমে স্বস্তিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। যাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ বহন করতে আগ্রহী তাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ কার্যালয়ে জমা দিলে আমরা তাঁদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকের মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

রেজিস্ট্রি খরচ—

প্রতি সপ্তাহে ২২.০০ টাকা।

এক মাসের পত্রিকা একসঙ্গে পাঠালে ৩০.০০ টাকা।

(বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছাড়াও এই রেজিস্ট্রি খরচ অতিরিক্ত দিতে হবে।)

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অন্তরালে অন্ধকার

বাংলা প্রকাশনা শিল্পের যাত্রা শুরু হইয়াছিল বটতলা হইতে। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে ইউরোপ হইতে মুদ্রণযন্ত্র আসিবার পর এই দেশে যে যুগান্তর ঘটিয়াছিল তাহারই প্রভাবে কতিপয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি রামায়ণ, মহাভারত, সত্যনারায়ণের পাঁচলি, পুরোহিত দর্পণ, সুগৃহিণী হইবার উপায় ইত্যাদি গ্রন্থ ছাপাইয়া পাঠকদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গ্রন্থ বিক্রয়ের অভিলাষে বটগাছের নীচে সমবেত হইতেন বলিয়া তাঁহারা বটতলার প্রকাশক নামে আখ্যায়িত হইয়াছিলেন। তাহার পর দুই শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। সেইদিনের বটবৃক্ষ অগণন ঝুরি নামাইয়া সুবিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আকারে প্রকারে বৃদ্ধি পাইলেও নিরবধি কালের প্রভাবে বটবৃক্ষটি জরার আগ্রাসন হইতে মুক্তি পায় নাই। বয়সের চিহ্ন তাহার সর্বাঙ্গে। ইহার সুযোগ লইতেছে অসাধু রাজনীতিক হইতে শুরু করিয়া কতিপয় অসাধু প্রকাশকও। দুর্ভাগ্যবশত এইসব অসাধু প্রকাশক যেমন কলকাতায় রহিয়াছেন, তেমনই রহিয়াছেন প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও। উভয়ের সম্মিলিত আক্রমণে নাভিশ্বাস উঠিয়াছে শতাব্দীপ্রাচীন সেই বটবৃক্ষটির যাহাকে অধুনা কলেজ স্ট্রিট নামে চিনি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের মধ্যবর্তী কালখণ্ডকে কলেজ স্ট্রিটের স্বর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বাংলাভাষাকে আজ আমরা যে উচ্চতায় দেখিতেছি উনবিংশ শতকের শুরুতে তাহা ছিল না। তৎকালে সংস্কৃতকে লোকে বলিত পণ্ডিতের ভাষা আর বাংলাকে বলিত চাঁড়ালের ভাষা। বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ ইংরাজিকেই প্রাণের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতেছিলেন। ডিরোজিও প্রমুখ ব্রিটিশ শিক্ষকের প্ররোচনায় এই প্রবণতা ক্রমশ বঙ্গসমাজে শশীকলার মতো বৃদ্ধি পাইতেছিল। ইংরাজি শিখিলে চাকুরি পাওয়া যাইবে, বিলাতে যাইয়া ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া ইংরাজ বড়োলাটের মতো স্বহস্তে নেটিভের মুণ্ড কাটিয়া ফেলা যাইবে, সর্বোপরি শাসক ইংরাজের নেকনজরে পড়া যাইবে— মোটামুটি এইসব কারণেই সেইকালে ইংরাজি শিখিবার চল হইয়াছিল। তখন বাংলাভাষায় সাহিত্য নাই, পাঁচালি, সঙের গান-খেউর ভিন্ন কোনো রচনাকর্ম নাই, এমতাবস্থায় কেহই-বা বাংলা শিখিবে? বিস্মৃতির আড়ালে চলিয়া যাওয়াই ছিল সম্ভবত বাংলাভাষার ললাটলিখন। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া হাল ধরিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ। তাঁহারা বাংলাভাষাকে সাহিত্যমুখী করিয়া তুলিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর একে একে মঞ্চে আবির্ভূত হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎচন্দ্র, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বঙ্গলক্ষ্মীর বিবর্ণ আঁচলখানিতে সাহিত্য সরস্বতীর বর্ণিল চিত্রমালা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। জোয়ার আসিল বাংলা প্রকাশনা শিল্পেও। ঝাঁকামুটের কাঁধ হইতে নামিয়া বাংলাভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ক্রমে স্থান পাইল প্রকাশকের গ্রন্থ বিপণীর সুসজ্জিত আলমারিতে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও এই ধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলিয়াছে। সাহিত্য সরস্বতী বাংলাভাষাকে বঞ্চিত করেন নাই। দশকের পর দশক জুড়িয়া বঙ্গভূমিতে সুলেখকের জন্ম হইয়াছে। প্রকাশকেরাও তাঁহাদের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া লক্ষ্মীলাভ করিয়াছেন। এই ধারায় বাধ সাধিল তিনটি ঘটনা— ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নামের একটি দেশের জন্ম, বাম আমলে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম হইতে ইংরাজি তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত এবং নব্বই দশকের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ হইতে সাহিত্য সরস্বতীর প্রস্থান। সন্দেহ নাই, বাংলাদেশ বাংলাভাষাকে যে মর্যাদা প্রদান করিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ তাহা পারে নাই। ফলত বাংলাদেশে প্রকাশনা শিল্প আকাশ স্পর্শ করিবার স্পর্ধা দেখাইতে পারিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বাম শাসক প্রাথমিক শিক্ষাক্রম হইতে ইংরাজি তুলিয়া দেওয়ায় বাঙ্গালির ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের প্রতি কাঙালপনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের আড়ালে পশ্চিমবঙ্গে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলগুলিকে জনপ্রিয় করিয়া তোলাই ছিল বাম শাসকের উদ্দেশ্য। তাহা ফলবতী হইয়াছে। বাঙ্গালি ইংরাজিয়ানা রপ্ত করিলেও ভুলিয়া গিয়াছে বাঙ্গালিয়ানা। ইহার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে সুলেখকের অভাব, সাহিত্যক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া লকডাউন, আমফান ইত্যাদি যুক্ত হইয়া এই বঙ্গের প্রকাশকদের অবস্থা সঙ্গিন করিয়া তুলিয়াছে।

ভাষা না বাঁচিলে প্রকাশনা শিল্প বাঁচে না। ইংরাজির চাপে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা এখন মরণাপন্ন। ইহার সুযোগ লইয়া বাংলাদেশের কিছু অসাধু প্রকাশক এই বঙ্গের পুস্তক বিনা অনুমতিতে ছাপাইয়া বিক্রয় করিতেছে। ইহার লভ্যাংশ এইখানকার প্রকাশকেরা পাইতেছেন না। কলকাতা পুস্তকমেলায় বিক্রয় উপর্যুপরি হ্রাস পাইতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে একদিন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা প্রকাশনা উঠিয়া যাইবে। সেই শূন্যস্থান দখল করিবে বাংলাদেশের প্রকাশকরা। সুতরাং এখনই সতর্ক না হইলে অন্তরালের অন্ধকার প্রকাশ্যে আসিয়া সোনার সংসার ছারখার করিয়া দিবে।

সুভাষিতম্

পরস্য পীড়য়া লব্ধং ধর্মস্যোল্লংঘনেন চ।

আত্মাবমানসংপ্রাপ্তং ন ধনং তৎ সুখায় বৈ।। (মহাভারত)

অন্যকে দুঃখ দিয়ে, ধর্মের উল্লঙ্ঘন করে অথবা নিজে অপমানিত হয়ে উপার্জিত ধনের দ্বারা সুখ লাভ হয় না।

মমতার তৃণমূলে ‘কেউ পদবাচ্য’ নয় কেন?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘পিসিকে তোমরা মারলে কেন, জবাব চাই জবাব দাও’। নয়ের দশকে লাঠিটা পতাকা করে এটাই বলত ছোট্ট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন যুব কংগ্রেস নেত্রী। তিন দশক পর দল দখলের লড়াইয়ে ‘বুয়া-ভাতিজা’-র ছায়া যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ‘অভিষেকহীন মমতা’ আর ‘মমতাহীন তৃণমূল’ অলীক কল্পনা। ছায়া লড়াইয়ে আক্রান্ত দলের ‘সপ্তরথী’। অভিমন্যু অভিষেককে বধ করতে তাঁরা উদ্যত হয়েছিলেন। মমতা তাঁর ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কেবল নিজের পদটা রেখে দলের বাকি সব পদ খারিজ করে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে মমতার কাছে এই দলে কোনো পদবাচ্য নেতা নেই। তিনি ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’। তবে ‘এক ব্যক্তি এক পদ’ নীতির জটিলতা মমতা কতটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছেন তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। কারণ এই নীতি তাঁর ব্রেন চাইল্ড বা মস্তিষ্কপ্রসূত। আপাতত তিনি তা ধামাচাপা দিয়েছেন। আমার ধারণা ৩১ মার্চের মধ্যে গোটা চিত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে। ৫০ শতাংশের বেশি তৃণমূল নেতার বয়স ষাট বা সত্তরের বেশি। মমতা নিজেও তাই। তবে তিনি ব্যতিক্রম। অভিষেকের বয়স ৩৫। দল বাঁচাতে আগামীদিনে মমতা যে তাঁকেই বেছে নেবেন সেটাই স্বাভাবিক।

মমতা ২০ সদস্যের জাতীয় কমিটি গড়েছেন। সেখানেও অভিষেকের পাল্লা ভারী যদিও তাঁর কোনো পদ নেই। দলে বিশ্বাসঘাতক খুঁজতে আইপ্যাক সংস্থাকে আমদানি করেছিলেন অভিষেক। সাত নেতা সে জালে ধরা পড়েছেন। অভিষেক আর আই প্যাক মিলে ‘জি-৭’-এর মুখোশ খুলে দিয়েছে। তাদের একজনকে বাদ দিয়ে কমিটি গড়েছেন মমতা। বাকি ছ’জনকে রাখলেও তিনজনকে পদহীন করে দিয়েছেন। আমার ধারণা মমতার বার্তা আগামীতে অভিষেক দল চালাবেন। তাই সব নতুন চিন্তা আপাতত তামাদি থাকছে।

> **প্রশান্ত কিশোর আগেই জানিয়েছেন বিজেপি থাকতে এসেছে, চলে যেতে নয়। বিজেপির সঙ্গে দৌড়ে টিকে থাকতে তৃণমূলের ‘বৃদ্ধাবাস’-কে ‘যুব আবাসে’ পালটাতে হবে। নাহলে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের এঁটে ওঠা মুশকিল।**

মমতার ঘরে-বাইরে সংকট। একদিকে দলের খুচরো নেতাদের মধ্যে মনোমালিন্য, অন্যদিকে আইপ্যাকের সঙ্গে তৃণমূলের বোঝাপড়া। আইপ্যাক জি-৭-এর চক্ষুশূল। কারণ তারা দলের ভিতর নিশ্চুপে বৃদ্ধ হঠাও প্রচার শুরু করেছিলেন। এক পদ এক ব্যক্তি নীতি আমদানির চেষ্টা করেছিলেন। যতদূর জানি মমতার ইঙ্গিতে তা করা হয়েছিল। উলটো প্রতিক্রিয়া হওয়ায় তা বন্ধ করা হয়েছে। আইপ্যাকের চুক্তি অভিষেকের সঙ্গে, মমতার সঙ্গে নয়। অভিষেকের পদ উঠে যাওয়ায় সে চুক্তি কীভাবে থাকবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

বিরোধীরা বলেছেন এসব ভাঁওতা। রাজ্যের সবাই জানেন তৃণমূলে মমতাই পোস্ট, বাকিরা ল্যাম্প পোস্ট। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা আর অত্যাচার অবিচারের থেকে নজর ঘোরাতে মমতা এইসব করছেন। তার প্রমাণ পুরভোটের দিন দলীয় বৈঠক নিয়ে মমতার অহেতুক ব্যস্ততা। রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আর ২৯৪টি বিধানসভা আসনে মমতা নিজেকে একক প্রার্থী বলে বহুবার ঘোষণা করেছেন। তাই জাতীয় কর্মসমিতির ঢক্কানিনাদ অর্থহীন। এক তৃণমূল নেতার কথায় ‘কর্মসমিতিতে থাকা কেবল দলীয় স্বীকৃতি। মানুষের কাছে তা মূল্যহীন’। তৃণমূলে দড়ি টানাটানির খেলায় রাজ্যের কিছু সাংবাদিক যুক্ত হয়ে গিয়েছেন। যেটা আদৌ কাম্য নয়। অভিষেকের দাপট খর্ব করতে তারা হাত-পা ধুয়ে নেমে পড়েছেন।

‘ছায়া যুদ্ধে’ পটু মমতা। তাঁর রাজনৈতিক সমীকরণ বোঝা দায়। পালটাপালটি করে তিনি বিজেপি আর কংগ্রেসের সঙ্গে ঘর করেছেন। এই মুহূর্তে রাজ্য বিজেপি দিশেহারা। তবে তা বেশি দিনের জন্য নয়। রাজ্য বিজেপি বাছা হয়েছে তরুণ তুর্কি নিয়ে। তারা লম্বা দৌড়ের ঘোড়া। শীঘ্র সংকট কাটিয়ে উঠবে। আই প্যাক কর্ণধার প্রশান্ত কিশোর আগেই জানিয়েছেন বিজেপি থাকতে এসেছে, চলে যেতে নয়। বিজেপির সঙ্গে দৌড়ে টিকে থাকতে তৃণমূলের ‘বৃদ্ধাবাস’-কে ‘যুব আবাসে’ পালটাতে হবে। নাহলে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের এঁটে ওঠা মুশকিল। সামনে রয়েছে পঞ্চায়েত আর ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। তাই আস্তিন গোটাচ্ছে অভিষেকের ‘নব তৃণমূল’। আই প্যাকের সঙ্গে অভিষেকের চুক্তি ২০২৬ পর্যন্ত। তাই নিজেই হাল ধরেছেন মমতা। বাকিরা ব্রাত্য। □

ভাইপো ভাইরাস

শব্দশিল্পী সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী কোথাও একটা বলেছিলেন, ভাগ্নারা ভালো হয় না, কারণ ওরা বোন থেকে আসে। বোনপোদের সম্পর্কে এমন 'পান' শোনা গেলেও ভাইপো সম্পর্কে এমন কথা কদাচ শুনিনি। তবে ইদানীং 'তোলাবাজ ভাইপো' শব্দবন্ধটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে সেটা বিরোধীদের মুখে। যাঁরা দিদির ভালো দেখতে পারেন না তাঁরা ওসব বলে, 'পিসি-ভাইপো' শুনতেও বাঙ্গালি অভ্যস্ত। কিন্তু একটা নতুন শব্দবন্ধ 'ভাইরাস ভাইপো' ইদানীং শোনা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। মানে পিসির কোম্পানিতে।

জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাওয়া ভাইপোর ইদানীং নাকি দলে খুব হম্বিতম্বি বেড়ে গিয়েছিল। পিকে দাদার পরামর্শে পিসি ভাইপোকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও দিয়ে দিয়েছিলেন। দিদির কোম্পানিতে মালকিন ছাড়া অন্য কোনও পদের গুরুত্ব অবশ্য কিছু নেই। সেই কবে মুকুল রায় ওই পদটা ছেড়ে দেওয়ার পরে কেউ আর বসেনি। এতদিন ফাঁকা থাকা পদ তার মানে খুব একটা প্রয়োজনের নয় বলেই সবাই বুঝে গিয়েছিল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলের পিছনে পিকের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ভাইপোকে ওই পদ দিয়ে দেওয়া হয়। আসলে ভাইপোই তো পিকে-কে রাজ্যে নিয়ে আসার ভগীরথ। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে গেল।

পিসি মানে দিদি কখনও ভাবতেও পারেননি যে তলে তলে ভাইপো আলাদা অফিস ঘর বানিয়ে আলাদা দল তৈরির পরিকল্পনাও করছিলেন। ধরিয়ে দিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে তিনি বলে দেন ওসব ভাইপো টাইপো কেউ নেতা নয়। আমার নেতা শুধুই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর যেই না বলা অমনি, ভাইপো ভক্তরা তেড়েফুঁড়ে ওঠে। সবাই মিলে রে রে করে ওঠে। ব্যাস সব দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যায়। দল মানে কোম্পানি যে দু' ভাগে ভেঙে রয়েছে ভিতরে ভিতরে তা স্পষ্ট হয়ে যেতেই দিদি মানে ভাইপোর পিসি রাশ হাতে নেন। এটা না হলে কিন্তু রক্ষে ছিল না। অনেকে আবার সবেতে চক্রান্ত দেখা বিজেপির হাত খুঁজছিল। কিন্তু বুদ্ধিমতী দিদি ও সব খোঁজেননি। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন একজন লাই পেয়ে মাথায় উঠেছে। একা ভাইপোয় রক্ষা নেই, পিকে দোসর। পরিস্থিতি বুঝে দিদি আর বিলম্ব করেননি। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছেন। পিকে কোম্পানিকে তাড়াবার আওয়াজ তুলে নিজের কোম্পানির সব পদ ভেঙে দিয়েছেন। আসলে কোনও পদই ভাঙেননি। কোম্পানির তো কোনও সংবিধান নেই যে, এই পদে এতজনকে বসাতে হবে, না হলে নিয়ম ভঙ্গ হবে! তাই আসলে ভাইপোর পদটা কেটে নিয়ে দিদি একটা সাড়ে বত্রিশ ভাজা কমিটি তৈরি করে দিয়েছেন। গালভরা নাম দিয়েছে জাতীয় কর্মসমিতি। যে পার্টির জাতীয় কর্মই নেই তার আবার জাতীয় কর্মসমিতি। এটাকে অনেকে বলছেন নকুলদানার ক্যাশমেমো।

সে যাই হোক, আপাতত যা অবস্থা তাতে ভাইপোর পদ নেই। তুমি ভাইপো যা, বীরভূমের কেষ্ট কিংবা উত্তরবঙ্গে গৌতমও তাই। সবাই বেঞ্চে বসে থাকা পদে। চেয়ারে একা পিসি, দিদি বলেছেন খুব তাড়াতাড়ি সবার দায়িত্ব ভাগ করে দেবেন কিন্তু সে যে কবে হবে কেউ জানে না। যখন হবে কেউ জানবেও না। তবে হবে। নিয়ম অনুযায়ী একটা কমিটি গঠন করে তা নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হয়। সেই নিয়ম মানতে কিছু একটা হবে। বলা যায় না, সেই কমিটিতে হয়তো মুকুল রায় ফিরে এলেন।

না, না। সেটা কী করে হবে! মুকুল রায় তো এখনও বিজেপি বিধায়ক। সেই যে একদিন মনে পড়ছে তারিখটা। ১১ জুন, ২০২১। তপসিয়ায় তৃণমূল ভবনে দিদি হাতে করে মুকুল রায়কে বরণ করে নিলেন। বললেন, ঘরের ছেলে ঘরে আয়। বড়ো কষ্টে ছিলি রে বাবা। ভাইপো আবার মুকুলপুত্র ভাইপোকে আদর করে কোলে নিয়ে বসাল। সে সব কিন্তু আদৌ সত্যি নয়। সত্যিটা বলে দিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার মশাই। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সংবিধানে শপথ নেওয়া স্পিকার, বলেছেন, মুকুল তো বিজেপিতেই। আসলে তৃণমূল ভবনে যা যা দেখেছিলেন, সেই মুকুল-বরণ অনুষ্ঠানের সব চরিত্রই ছিল কাল্পনিক। হোলোগ্রামও ভাবতে পারেন। সবাই আছেন। কিন্তু আসলে কেউ নেই। কেউ ছিলেন না। মুকুল বিজেপিতে ছিলেন, আছেন। তবে দিদি মানে পিসি এখন অন্য কাজে বেশি ব্যস্ত। দলে ভাইপো নামক যে ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছিল তা থেকে কোম্পানিকে বাঁচাতে মরিয়া তিনি। আগামীদিনে কিছু ভাইপো দরদির উপরে খাঁড়ার ঘা আসতে পারে। □

অতিথি কলম

চেতন ভগত

আমাদের সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না

স্বাধীনতার প্রাকপর্ব থেকে এই পরবর্তী ৭৫ বছর ইংরেজিতে কথা বলতে লিখতে অভ্যস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উপদেশ তথা পর্থনির্দেশগুলি আমাদের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, পুস্তক প্রকাশক ও রাজনীতিবিদদের কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করা মৃত্যুকে চুম্বন করার শামিল। বিষয়টা কেন এমন সেটাই একটু বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

ভারতের বসবাসকারী ভূমিপুত্র-সহ বিচিত্র সংস্কৃতির বহুধাবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে সংখ্যার বিচারে অত্যন্ত নগণ্য এক শ্রেণীর পরিশীলিত নাগরিকরা বাস করেন। তাঁরাই সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। এঁরা বিশেষ করে দেশে ইংরেজি ভাষার দামামা পেটান। পরবর্তী অংশে আমরা এদের সংক্ষেপিত একটি নামে চিহ্নিত করব IIDEs (India's Intlcatual & discerning elites)। যেহেতু ইংরেজি ভাষায় কিছুটা ব্যুৎপত্তি থাকলে আমাদের দেশে তাঁদের অন্যদের থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বলে ধরে নেওয়া হয়, সেই হেতু শুরু থেকেই এঁরা একটা বাড়তি কদর পেয়ে থাকেন। এঁদের কথাবার্তা, ভাষ্য সর্বদাই অন্যদের থেকে বেশি গভীর এমনটা ধরে নেওয়াই রীতি।

IIDE's-রা জন্ম থেকেই বৌদ্ধিকভাবে বিশেষ সুবিধেপ্রাপ্ত শ্রেণী হিসেবে বেড়ে উঠতে থাকেন। এর মানে এই নয় যে তাঁদের কাছে সব সময় প্রচুর টাকা রয়েছে। তারা কৈশোরে ইংরেজি কাগজ, সাপ্তাহিক, বইপত্র একইসঙ্গে পরম রোমাঞ্চকর ইংরেজি চলচ্চিত্র দেখার একটি প্রত্যুষপর্বেই জেনে যান ইংরেজি ভাষার বিশিষ্ট বইগুলির নাম ধাম। সেই ভাষায় লেখার জন্য কি তাদের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার দেওয়া হয়। এর প্রভাবে যখন তারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন তা যে কোনো বিষয়ে কী রাজনীতি কী সাংস্কৃতিক আবহ বা লেখালিখির জগৎ যা কিছু হতে পারে। সেই মতামতগুলি ওই ইংরেজি কৌলিন্যের জোরে বাড়তি গুরুত্ব লাভ করে।

বিষয়টা এমন দাঁড়িয়েছে ইংরেজিতে কেউ প্রশংসা না করলে ঠিক মন ভরে না। অনেকেই চমৎকার কোনো বই লিখেছেন, কেউ-বা সুন্দর সংগীত-নৃত্য কুশলতা দেখিয়ে দেন, কিংবা কেউ উৎকৃষ্টমানের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। কিন্তু ততোধিক বিদগ্ধ দেশীয় সমঝদাররা ভূয়সী প্রশংসা করলেও ইংরেজি ভাষায় লেখা বাহবা না পেলে সবই বুঝি বৃথা গেল। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই রাজনীতিবিদরা চলচ্চিত্র নির্মাতারা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা, আপনি এবং আমিও একই পথের পথিক। আইআইডিই-রা প্রশংসা না করলে কিছুতেই জাতে উঠতে পারব না। অবশ্যই মাত্রার তফাত আছে, কেউ অতি উৎসুক কেউ চাপা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার লেখাটিকে তাঁদের উদ্দেশে একটি ওয়ার্নিং হিসেবে নিতে বলব। আমাদের ভারতবর্ষে যেখানে মাতৃভাষা ইংরেজি নয় সেখানে ইংরেজিতে অনুমোদন পাওয়ার উদগ্র বাসনা মৃত্যু-চুম্বন আবাহনকারী। এই আইআইডিই-দের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র পাওয়ার একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে অবশ্যই। তবু বলব, যারা দেশের গরিষ্ঠাংশ মানুষের মধ্যে কাজ করতে চান, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চান, সংস্কৃতি চর্চা করতে চান, তাঁরা কদাচ এঁদের জালে জড়াবেন না।

এই আইআইডিই-বাহিনী ভালো ইংরেজি জানে, এদের তথাকথিত রুচিও খুব পরিশীলিত। কিন্তু হায়! তারা ভারতবর্ষের অ, আ, ক, খ-ও জানে না। ভারতীয়দেরও চেনে না। একইসঙ্গে ভারতীয়দের চিন্তাস্রোত সম্পর্কেও তাদের কোনো সঠিক ধারণা নেই। এখানেই প্রশ্ন ওঠে IIDC's-এর লক্ষ্য নিয়ে। তাদের লক্ষ্য কিন্তু ভারতীয়দের কাছাকাছি পৌঁছনো নয়। তাদের উদ্দেশ্য তারা যে অন্যদের থেকে উন্নত মানের, সূক্ষ্ম বৌদ্ধিক মননের অধিকারী তা প্রমাণ করার। রুচি, নীতিবোধ ও মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রে তারা গড় পড়তা ভারতীয়দের থেকে অনেক উচ্চমার্গে বিচরণ করেন। তাঁরা তাঁদের এই বিশেষ স্টেটাস ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সাধারণ ভারতীয়রা তাদের এই মানসিকতা মোটেই পছন্দ করে না এবং মেনেও নেয় না। তা সত্ত্বেও তাদের হয়ে ঢোল পেটাতে সমগোত্রীয় আরও একদল আইআইডিই সব সময়ে সমর্থন নিয়ে হাজির থাকে। তারা তো ভিন্নগোত্রের তালি বাজানো চায় না, নিজেদের মধ্যে মুখ শোঁকাশুঁকিই তাদের যথেষ্ট। এটি একেবারে ভেজালহীন পরিশীলিত প্রতিধ্বনি ঘর যেখানে নিজেরাই নিজেদের পিটচাপড়ানি নিয়ে মগ্ন। কিন্তু সাধারণ ভারতবাসীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই এঁদের জালে জড়িয়ে পড়লে (এঁদের প্রশংসার আশায়) আপনি নিজের কর্মোদ্যোগ ও সামগ্রিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবেন। আমাদের এই সমসাময়িক ভারত থেকে এই সূত্রে আমি তিনটি উদাহরণ তুলে ধরব।

(১) ইংরেজি ভাষায় লেখালিখির প্রকাশক সংস্থাগুলি। আইআইডিই-র দলবল সর্বদা এদের কাছে ছোটে। যেমন এলইডি আলো ঘিরে ক্রিকেট মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা সেদিকে ছুটে যায় (এঁরা অবশ্য বিষয়টার অনেক জটিল ও নান্দনিক তুলনা দিয়ে বিভ্রান্ত করবেন)। এখানে তারা Literary fiction নামে এক ধরনের নিজস্ব ঘরানার লেখালেখি নিয়ে নাড়া ঘাটা করে। অন্য যা কিছু সবই তাদের কাছে ঘৃণ্য। এই সাহিত্যগত কাহিনি (Literary fiction বস্তুটি কী তা বস্তুত বোঝানো খুবই শক্ত।

১৯৯০ সালের পর এই ধরনের লেখালিখি সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে একেবারে বাতিল হয়ে গেছে। বেশিরভাগ সময়ই এই ধরনের লেখায়

উপজীব্য লেখকের ব্যক্তিগত ধ্যানধারণাকে উল্লেখিত IIDE's ধাঁচার মধ্যে রেখে আবোল তাবোল বকা। বিশেষত্ব হচ্ছে, ভাষার মধ্যে খুব কারিকুরি থাকা জরুরি যাতে বদ উদ্দেশ্যে লেখাগুলি মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। আজকের দিনে কেউ এদের লেখা পড়ে না, বিক্রিও হয় না।

এই সাহিত্য কাহিনিগুলি স্বভাবতই IIED গোষ্ঠীর বিপুল বাহবা আদায় করে। যদিও খোঁজ করে দেখা গেছে যে, কোনো একটির বিক্রি ১০০ কপিরও কম। আসলে গ্রন্থের মূল উপজীব্য মূলধারার যথার্থ সাহিত্য মূল্যের গ্রন্থগুলির লেখকদের নস্যাৎ করে দেওয়া। জনপ্রিয় সু-সাহিত্যগুলি প্রশংসা প্রাপ্তির যোগ্য এবং বহু মানুষ স্মার্ট ফোন ছেড়ে এখনও এগুলি পড়েন। এমন লেখকদেরও একই সঙ্গে সেই রুচিশীল পাঠকদেরও বিদ্রূপ করেন ও নিম্নরুচির পাঠক বলে দাগিয়ে দেন। এইসব লেখকের সুললিত ভাষায় দিব্যি গালিগালাজ করে পাঠকদের রুচিকে অন্য খাতে বইয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেন। অথচ তাঁদের এই জঞ্জাল চরিত্রের লেখালিখিগুলির অঢেল অন্যায্য প্রশংসার ফলে অজান্তে প্রতারিত হয়ে যাওয়া প্রকাশকরা এদেরই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই কারণেই বাজারে ভারতীয় প্রকাশকদের হাতে এই IIED প্রজাতির লেখকদেরই ভিড়। পরিণতিতে গোটা পুস্তক শিল্পটিই আজ ক্ষতিতে চলছে। সম্প্রতি এদেরই লেখা প্রকাশ করা একটি বড়ো প্রকাশনা সংস্থা বন্ধ হয়ে গেল। একই সঙ্গে ইঙ্গিত দিয়ে গেল এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের।

ভাবুন, এই IIDE গোষ্ঠীর লেখকরা যখন পরিকল্পিত ভাবে তাঁদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচ্ছন্ন মতবাদ প্রচারকারী লেখাগুলিকেই মূল সাহিত্য বলে প্রচার করেন তখন লোকে তাঁদের বইও পড়েন না এবং গালাগালি দেওয়ার ফলে ভালো লেখাগুলিকেও ছেড়ে দেন। তাঁরা ইউটিউবে মশগুল হয়ে যান। প্রকাশনা সংস্থাগুলি IIDE-র মৃত্যু চুম্বনে শেষ হয়ে যায়।

(২) এবার কংগ্রেস দল প্রসঙ্গ। IIDE's কিন্তু কংগ্রেস দলকে ভীষণ পছদ করে। এর অন্যতম কারণ বা মিলনবিন্দু হচ্ছে দুটি সংস্থাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর তীব্র ঘৃণা পোষণ করে। রাহুল গান্ধীর বিখ্যাত সব বক্তৃতা বাজারে নামলেই IIDE-র মাতব্বররা তা একেবারে চাঁদের কাছাকাছি নিয়ে যান। এর ফলে কংগ্রেস এখন IIDE-র ভয়ংকর অনুরক্ত। এমনকী তাদের কাজকর্মের অ্যাজেন্ডা তৈরিও প্রায়শই এদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। একটা উদাহরণ দিলে বোঝা সহজ হবে। IIDE মনে করছে ভারতে এখন তীব্র ধর্মীয় গোঁড়ামির শাসন চলছে, ভারত ক্রমশ হিন্দুরাষ্ট্র হয়ে উঠছে। এদেশে কোনো মুসলমানের নিরাপত্তা নেই। কেন্দ্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় থাকা শক্তিধর শাসকরা কেবলমাত্র দুটি উদ্যোগপতি পরিবারকে বিশেষ সুবিধে প্রদান করছে। IIDE-র ধনুর্ধররা সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের ব্যস্ত রাখে কোথায় তাদের এই আজব তত্ত্বের সমর্থনে কী পাওয়া গেল সেই সন্ধানে। তারা হন্যে হয়ে প্রমাণ করতে চায় ভারত এখন সম্পূর্ণ মেরুকরণ বা ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত একটি দেশ। তারা সুবিধেজনকভাবে ভুলে যায় ১৪০ কোটি জনসংখ্যার একটি বিশাল দেশে যেখানে বিভিন্ন চরিত্রের হাজার হাজার নেতা বিচরণ করে সেখানে কেউ কিছু প্রলাপ বকে ফেলতেই পারে। তক্কে তক্কে থাকা IIDE কিন্তু এমনই পুঁটিমাছ জালে তুলে প্রচার শুরু করে— দেখো এই হচ্ছে ভারতের আসল অবস্থা। হায়! কংগ্রেসও সঙ্গে সঙ্গে এটিকেই ধ্রুবসত্য মেনে নিয়ে নিজেদের অ্যাজেন্ডা তৈরি করে ফেলে।

কিন্তু ভারতের প্রকৃত চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধিকাংশ ভারতবাসী সকাল-সন্ধ্যে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে ভাবে না। তুমি যদি বিশাল দেশে নানা ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বর্জ্য নিয়ে নিত্য ঘাঁটাঘাটি করে সেগুলি জুড়ে মানুষকে বোঝাও যে, এটিই একমাত্র বাস্তব তাহলেও সেটা কিন্তু সত্য হবে না। কংগ্রেস কিন্তু IIDE-র এই জালে পড়েছে। না বেরোলে বিপদ বাড়বে অর্থাৎ মৃত্যুচুম্বন।

(৩) প্রথম যখন Netflix Platform পাশ্চাত্য সব অনুষ্ঠান নিয়ে ভারতে ঢুকল IIDE সেখানে উন্মাদ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা মনে করেছিল এখানকার shot-গুলি একেবারে তাদের মনোভাবের সঙ্গে খাপ খায়। নেটফ্লিক্সও তাদের স্বার্থগন্ধী প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে জালে পড়ল। সারা ভারতের দর্শকের কথা তারা বিস্মৃত হলো। তোয়াক্কা করল না তাদের ভালো-মন্দ লাগা, গরিষ্ঠাংশের রুচির। তাদের shot-গুলি IIDE-র ক্যাপ্টেনদের কথা মাথায় রেখে ওটিপি-তে (এটি সিনেমা নয় আলাদা পয়সা দিয়ে দেখতে হয়। অনেক সময় অনেক কিছুই বলা যায়। খুব বেশি লোক এগুলি দেখতে পায় না) প্লাটফর্মে ছবি ছাড়তে শুরু করল। পরিণতিতে তারা অন্য ওটিপি প্লাটফর্ম যেমন প্রাইম ভিডিয়ো, আমাজন হইচই ইত্যাদি বহু চ্যানেলের কাছে হেরে গেছে। সম্পূর্ণ জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। তাদের আয় এত কমে গেছে তারা IIDE-র মৃত্যুচুম্বনের খুব নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। কারবার গুটিয়ে নিতে হতে পারে যদি না জাল কেটে বেরোয়।

এই কারণে জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষেরও এ থেকে শিক্ষা নেওয়ার আছে। অন্য লোকের কাছ থেকে মতামত ধার করে নিজের লক্ষ্য স্থির করো না। নিজের মনে বিশ্লেষণ করে নিজের পথসন্ধান করে এগোতে হবে। সে কাজে এমন কারুর পরামর্শ নেওয়া ঠিক নয় যারা নিজেদের সবজান্তা ভাবলেও আদতে তা নয়।

(লেখক একজন সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক বিমল রায় গত ৮ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। তিনি প্রথমে

ব্যারাকপুর শাখার স্বয়ংসেবক হন। ১৯৬৮ সালে উল্টাডাঙ্গায় বসবাস শুরু করেন। উল্টাডাঙ্গা শাখায় কার্যবাহ থাকাকালীন জরুরি অবস্থা জারি হয়। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেন। পরবর্তী সময়ে জনসঙ্ঘ, পরে বিজেপির বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

কোয়াড সম্মেলনে কঠোর নিন্দা চীনের আধিপত্যবাদের

ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে চীন গণ্ডগোল করতে চাইলে ভারত যে চোখে চোখ রেখে জবাব দেবে তা আবারও বুঝিয়ে দিলেন দেশের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। চীনের মোকাবিলায় তৈরি হওয়া চতুর্দেশীয় অক্ষশক্তি কোয়াড (যাতে রয়েছে আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত)-এর সম্মেলন শেষে সিডনিতে দাঁড়িয়ে চীনকে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তিনি বলেন, একটা দেশ (পড়ুন চীন) যদি ক্রমাগত আন্তর্জাতিক সীমারেখা বরাবর সেনা সমাবেশ করে লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তখন সামগ্রিকভাবে তা আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে উদ্বেগে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের মাঝামাঝি সারা বিশ্বেই কোভিড সংক্রমণের চূড়ান্ত বাড়বাড়ন্তের সময়ে গালওয়ান সীমান্তে অবৈধ সেনা সমাবেশ এবং ভারতের সীমানায় তাদের প্রবেশ করিয়েছিল চীন। তারপর কূটনৈতিক-সামরিক পথে তার মোকাবিলা করে ভারত। তারপর চীনের লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয় যে, তারা আর সীমান্ত অঞ্চলে অবৈধ অনুপ্রবেশ করবে না।

প্রসঙ্গত, ২০০৭-০৮ সালে চীনের আধিপত্য রুখতে ভারতের সঙ্গে আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া মিলিতভাবে কোয়াড গড়ে তোলে। এর পরে দ্রুত আন্তর্জাতিক সমীকরণ বদলায়। ফলে কোয়াড ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ২০১৭ এর কাজ আবার পুরোদমে শুরু হয়। কোয়াডের মুখ্য কাজ হলো, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং যাতে ওই অঞ্চলে সুখ-সমৃদ্ধি আনা যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ করা। কিন্তু ক্রমাগত ওই অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তার করাই চীনের অন্যতম লক্ষ্য। কোভিড পরিস্থিতিতে ওই অঞ্চলে সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করাই চীনের অন্যতম লক্ষ্য। কোভিড পরিস্থিতিতে ওই অঞ্চলে টিকা-বণ্টন-সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে কোয়াড যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। চীনের 'আধিপত্যবাদ' তাতে সংকটগ্রস্ত হওয়ায় চীন ক্রমশ মরিয়া হয়ে ওঠে। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে সেনা সমাবেশ করে লিখিত চুক্তির খেলাপ তো করেই, সেইসঙ্গে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি-সুস্থিতি বিনষ্ট করতে একের পর এক আগ্রাসী পদক্ষেপ নিচ্ছে।

চীনের এই আগ্রাসী মনোভাব রুখতে ভারত সামরিক-কূটনৈতিক বাণিজ্যিক কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে চীনের ২০২০ সালে গালওয়ান সীমান্তে সেনা সমাবেশের সময় ভারত প্রায় তিনশোটির মতো চীনা মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সম্প্রতি আবার চুয়ান্নটি অ্যাপ ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে চলেছে। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, ওই অ্যাপগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভারতীয়দের মোবাইলে যে ক্ষতিকর সফটওয়ার প্রবেশ করছিল, তার থেকে অন্তত নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। এই সফটওয়ার প্রবেশ করিয়ে ভারতীয়দের আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যাঙ্ক-সহ অনেক তথ্য জেনে যাচ্ছিল চীন। আগ্রাসী মনোভাব রুখতে একের পর এক কৌশল নিচ্ছে দেখে চীন এখন রটাচ্ছে যে, কোয়াড অধিবেশনের ফলে বিশ্বে সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট হবে। আন্তর্জাতিক সংঘাতের পথও নাকি প্রশস্ত হবে।

কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে চীনের এই অসার যুক্তি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, কোয়াডের লক্ষ্য ইতিবাচক কাজ করা। তাই আপাতত চীনের আগ্রাসী মনোভাব রুখে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সুস্থিতি ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট কোয়াড।

চীনের এই আধিপত্যবাদী মনোভাব অবশ্য আন্তর্জাতিক দুনিয়ার কাছে নতুন কিছু নয়। গালওয়ানের ঘটনার পর কোয়াডের একটি সম্মেলন হয়। আমেরিকার নেতৃত্বে ৩৯টি দেশ চীনকে এনিয়ে ঝাঁঝালো আক্রমণ করে। ভুক্তভোগী ভারত কূটনৈতিক কৌশলগত কারণে সেভাবে মুখ না খুললেও নীরব সমর্থন দেয়। তারপর কূটনৈতিকভাবে চীনকে একঘরে করতে শুরু করে ভারত। সেকাজে পুরোদস্তুর সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার ফাঁকফোকরগুলো ভরাট করার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হয়। ভারতের বাজারে চীনা পণ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চীনের ঘুণ ধরা অর্থনীতিকে আরও আঘাত হেনে বিপর্যস্ত করা হয়। এরই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় চীনের আগ্রাসী নীতির কঠোর নিন্দায় মুখর হলো কোয়াড।

ভারতের এই সফল কূটনৈতিক দৌত্যে চীন এই মুহূর্তে রাশিয়ার সমর্থন পেতে মরিয়া। কূটনৈতিকভাবে চীন পাকিস্তানের কাছে খুব বেশি কিছু আশা করে না। কেবলমাত্র ভারতে সন্ত্রাসবাদী হানা চালানোর কাজে পাকিস্তানকে ব্যবহার করে। কিছুটা রাশিয়া আর পাকিস্তানের কাঁধে হাত রেখে আধিপত্যবাদ যে বেশি দূর প্রসারিত করা যাবে না, সেটা চীনও এখন বুঝতে পেরেছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে সতর্ক নজর রেখেছে ভারত।

এদিকে চীনের সুরে সুর মিলিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে এদেশের চীনপন্থীরা। তাদের মুখপত্র স্বরূপ 'বহুল প্রচারিত' একটি দৈনিক তাদের প্রতিবেদনে মনে করেছে, এই কোয়াড সম্মেলনের ফলে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্থিতি নাকি বিনষ্ট হবে! দেশের খেয়ে পরে দেশেরই বিরোধিতা করার মারাত্মক প্রবণতা এবার থামানো দরকার। □

হিন্দুত্বে কালিমালেপন এখনকার ইন্টেলেকচুয়াল ট্রেন্ড

হিন্দুত্বকে শুধুমাত্র ধর্মের গণ্ডিতে বেঁধে ফেলা যায় না। হিন্দুত্ব একটি মহৎ জীবন দর্শন, সমস্ত জাতিসত্তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় উন্নীত করার মঞ্চ। এককথায়, ভারতের সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ধর্ম।

নিখিল চিত্রকর

হিন্দুধর্মই যে বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্ম তা নিয়ে সাম্প্রতিক বিশ্বের পণ্ডিতদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতরা তাঁদের লেখা প্রামাণ্য গ্রন্থে হিন্দুধর্মের প্রাচীনতার কথা উল্লেখ করেছেন। উৎপত্তিলগ্নে 'সনাতন ধর্ম' রূপেই হিন্দুধর্মের পরিচিতি। পণ্ডিতদের মতে হিন্দুধর্ম কোনও একজন ব্যক্তির মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। ভারতের ভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মতাদর্শ নিয়েই তার সৃষ্টি।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৫০০-এর মধ্যের সময়টিকে বৈদিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৩০০-এর মধ্যে হিন্দুত্বের অবতারণা। ধর্ম, অর্থ, কর্ম ও মুক্তিতেই হিন্দুধর্মের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত।

অল বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮) তাঁর 'তহকিক-ই-হিন্দ' বা 'ভারত তত্ত্ব' গ্রন্থে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। আজও হিন্দুধর্ম বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ হিসাবে স্বীকৃতি রয়েছে অল বিরুনীর। তাঁর লেখা 'ভারত তত্ত্ব' হিন্দুত্বের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

বাঙ্গলার সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখনীতে হিন্দুধর্মের জয়গান গেয়েছেন। হিন্দু হিসেবে নিজেদের গর্বের কথা লিখেছেন প্রকাশ্যে। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর 'হিন্দু' কবিতায় লিখেছেন—''লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম, হই যেন আমি হই গো হিন্দু / যার দেবাগার শ্যামল পাহাড়, যার দেবাসন সুনীল সিন্ধু।" ইদানীং তো বাংলার সাহিত্যিকরা হিন্দু ধর্মের যেকোনও প্রসঙ্গেই 'সাম্প্রদায়িকতার' বীজ দেখতে পান, অথচ আঠারো শতকের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক বারংবার হিন্দু জন্মের বাসনায় কলম ধরেছেন।

মা কালীর বন্দনায় কলম ধরেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল শ্যামাসংগীত। সনাতন ধর্মের 'শাক্তদর্শন' আকর্ষণ করতো

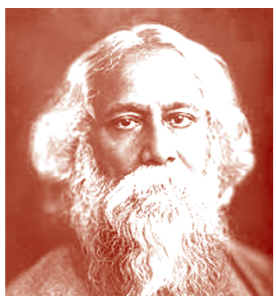

নজরুলকে। এই শাক্তদর্শন থেকেই নজরুলের শ্যামাসংগীত রচনা শুরু। শ্যামাসংগীত রচনায় পরিপূর্ণতা আনতে কালী সাধনাও করেছিলেন। মুসলিম সমাজ নজরুলের বিধর্মীয় অনাচার ভালো চোখে দেখেনি। একটা সময় পূর্ববঙ্গের রেডিয়োতে নজরুলের শ্যামাসংগীত সম্প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। মুসলিম হয়েও হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য নিয়ে প্রত্যয়ী ছিলেন কাজী নজরুল। তাঁর লেখায় 'ভক্তি, আমার ধূপের মত; / ঊর্ধ্বে উঠে অবিরত / শিবলোকের দেব-দেউলে/মা'র শ্রীচরণ পরশিতে।' হিন্দু ধর্ম নিয়ে তাঁর ভক্তির ব্যাপ্তি তিনি এভাবেই নিজের লেখায় প্রকাশ করে গেছেন। সংগীত বিষয়ক নজরুলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'রাঙা-জবা'। ১৯৬৬ সালে ১০০টি শ্যামাসংগীত সমৃদ্ধ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শক্তি পূজায় তাঁর ভক্ত হৃদয়ের অকৃত্রিম আকুলতা ও আর্তি রাঙা-জবা'র গানের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে।

সনাতন ধর্মের সুধাসম্পৃক্ত সাহিত্য উপহার দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। আশি বছরের পরিপূর্ণ জীবনে রবীন্দ্রনাথের মনন, চিন্তন, লেখায় বর্ণিত আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি হলো ভারতের প্রাচীনতম সনাতন ধর্ম ও উপনিষদ। তাঁর নিজের কথায় 'আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে'। পরবর্তী কালে যা তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের ক্ষুদ্র সত্তার মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধি করেছেন সারাজীবন ব্যাপী। তিনি লিখেছিলেন, 'উপনিষদের সব পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটি নারীর ব্যাকুল বাণী ধ্বনিত মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে—যা কখনোই বিলীন হয়ে যায়নি'। তাঁর ঈশ্বরচিন্তার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গীতিমালা, গীতালি ও ধর্মসংগীত প্রভৃতি কাব্য ও গীতিসংকলনে। হিন্দুদের ঐক্য নিয়ে সেযুগেও চিন্তিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কালান্তরে 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'কত বিপদ গিয়েছে। কই, একত্র তো হইনি! বাহির থেকে যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।' স্বধর্মের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল হলে, এমন উদ্বেগ

আসে, তা উদ্ধৃত অংশ থেকে স্পষ্ট।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে প্রথম রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচিন্তার আভাস পাওয়া যায়। এখানেই তাঁর কলমে সনাতন ধর্মের চিরায়ত অমোঘ বাণী উচ্চারিত হয়েছে : 'মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা, আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা মহেশ্বর।' কবিগুরুর জীবন দর্শন প্রভাবিত হয়েছিল সনাতন ধর্মের অনুশীলনে। সেই জীবন চর্চায় মিশেছে গূঢ়তত্ত্বের ফল্গুধারা। তিনি বলেছেন— 'শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ দিব্যধামবাসী / আমি জেনেছি তাঁহারে / মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়'।

সাহিত্যে জাতীয়তা'র বীজ রোপণ করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। বঙ্গভঙ্গের ঠিক আগেই 'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকটি রচনা করেন তিনি। বীর যোদ্ধা রাণা প্রতাপ তাঁর নাটকে বিধর্মী মুঘল সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রান্ত হিন্দু হিসেবে সমাদৃত। নাটকে 'ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে' গানটি শিহরণ জাগিয়েছিল দেশবাসীর মনে। নাটকে 'জয় মা ভারতী, জয় মা কালী' জয়ধ্বনি জাতীয়তাকে প্রাধান্য দেয়। তাঁর 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) এবং 'মেবার পতন' (১৯০৮), নাটকদুটিও মুঘল-রাজপুতের বা হিন্দুর সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও আত্মপ্রতিষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই উপস্থাপিত হয়েছে। ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মসমর্পণ, ভক্তি, কৃচ্ছসাধনার বিভাবে রঞ্জিত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কলম।

বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে কাজটি সম্পাদনা করেছেন তা নিশ্চিতভাবেই 'নব হিন্দুত্ব' বা হিন্দু পুনরুজ্জীবনের সৃষ্টি। তাঁর ভাবধর্মী লেখনী ধর্ম ও সমাজের পরিপূরক। তাঁর সাহিত্যের মননশীলতা ধর্ম চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু ধর্মের ভাবনায় কেন্দ্রীভূত হয়। বঙ্কিমের 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯) 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ১৮৮৮, ২য় ১৮৯২), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দুত্বের চেতনায় ঋদ্ধ। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস আনন্দমঠও হিন্দু জাতীয়তার বুননে ঋদ্ধ।

"রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'উপনিষদের সব পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটি নারীর ব্যাকুল বাণী ধ্বনিত মন্ত্রিত হয়ে উঠেছে—যা কখনোই বিলীন হয়ে যায়নি'"

অথচ ইদানীং কালের বাংলা কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় হিন্দু ধর্মকে কালিমালিপ্ত করার একটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চেষ্টা দেখা যায়। কবি শ্রীজাত তাঁর কবিতায় ত্রিশূলে যৌনতা সম্পর্কিত শব্দ জুড়ে হিন্দুদের সংবেদনশীলতায় আঘাত করেছেন। ধর্ম নিয়ে এমন ইতর পর্যায়ের, নিম্নরুচির সাহিত্য এযাবৎ বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ! শ্রীজাতর মতো অনেকেই অবশ্য নিছক জনপ্রিয়তা লাভের জন্যই এমন যবনগিরি করে থাকেন।

শুধু শ্রীজাত নন, হিন্দু ধর্মের প্রতি অ্যালার্জি অনেকেরই আছে। কবি সুবোধ সরকার লিখেছেন, 'দুর্গার দশহাত কখনও ছিল না, আজও নেই' অথবা '....মাটির দুর্গাকে প্রণাম করে কী হবে?' ২০০২ সালে গুজরাত দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রচ্ছদে ত্রিশূলের প্রান্তে বিদ্ধ সদ্যজাতের ভ্রূণের ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী তথা শাসকদলের পদাধিকারী সায়নী ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় শিবলিঙ্গে নিরোধ পরানো কার্টুন পোস্ট করে যে নীচ ও কুরুচিকর সহবতের পরিচয় দিয়েছেন, তা সভ্য সমাজে অমিল।

একসময় ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) তাঁর কলমে লিখেছিলেন, 'আমাদের প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যে তো 'হিন্দু' শব্দটি পাওয়াই যায় না। আমাকে বলা হয়েছে যে, এই শব্দটি খ্রিস্ট্রীয় অষ্টম শতকের হিন্দুস্থানি এক তান্ত্রিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেখানে হিন্দু নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম নয়'। নেহরু যদি বেদ-উপনিষদ পড়ার চেষ্টাটুকু করতেন তাহলে, এমন অজ্ঞের বুলি আওড়াতে হত না।

বিশ্বের সর্ব- প্রাচীন সনাতন হিন্দু ধর্ম নিয়ে সারা বিশ্বের মাথাব্যথা। জুলিয়াস রবার্ট, ওপেনহাইমারদের মতো তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থ পাতার পর পাতা পড়ে ফেলেছেন। বদলে গেছে তাঁদের জীবনশৈলী। আবার অনেকে সাম্যবাদী হিন্দুত্বের গূঢ় রহস্য অনুধাবন করতে না পেরে, কাদা ছোড়াছুঁড়ি করেছে। বস্তুত, হিন্দুত্বকে শুধুমাত্র ধর্মের গণ্ডিতে বেঁধে ফেলা যায় না। হিন্দুত্ব হলো, একটি মহৎ জীবন দর্শন, সমস্ত জাতিসত্তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় উন্নীত করার মঞ্চ। এককথায়, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ধর্ম। জীবনে যা কিছু মহান, তাকে টেনে নামানোর প্রয়াস তো চিরন্তন। অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা অনুধাবন হতো কীভাবে? □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

অখিলেশ যাদবের সমর্থনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট প্রচার

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি খবরে জানা গেছে বেশ কয়েকজন বিজেপির মন্ত্রী, বিধায়ক বা নেতা দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে সপা বা অন্য দলে যোগ দিচ্ছেন বা দেবেন। তাদের দল ছাড়ার কারণ হিসেবে জানা যাচ্ছে— ৪০৩টি আসন বিশিষ্ট উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বিধায়ক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে নজরে রেখে বিজেপি আগে ঠিক করে ১০০টিরও বেশি আসনে প্রার্থী বদল হবে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আপত্তি জানানোয় ওই সিদ্ধান্ত কিছুটা বদলায়। গত সপ্তাহের শুরুতে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আর যোগীজীর মধ্যে বৈঠকের পর বিধায়ক পরিবর্তন সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধায়ককে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে একেবারে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং বেশ কিছু বিধায়কের আসন বদল করা হয়। যাঁরা ভোটের টিকিট থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন মূলত তাঁরাই বিরোধিতা করে দল বদল করছেন।

> বিজেপি দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে একটি অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রীর সুধাবচন— 'তুই, তুমি কে ভাই? দাঙ্গাবাজ, হরিদাস, গণতন্ত্রের থাপ্পড়, কান ধরে ওঠবোস, কোমরে দড়ি বেধে ঘোরাতে পারি ইত্যাদি শব্দ কিন্তু উত্তরপ্রদেশবাসীও মনে রেখেছে।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা মতো— উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, গোয়া ও মণিপুর এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে এবং শেষ হবে ৭ মার্চ। ভোটের ফলাফল জানা যাবে ১০ মার্চ। সেই হিসেবে ওই সমস্ত রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী দলের মধ্যে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। আর এই ভোটকে কেন্দ্র করে বিজেপি বিরোধীরা এককাট্টা হওয়ার চেষ্টা করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এরাজ্যের শাসকদল পুনরায় ক্ষমতা দখল করে সারাদেশে বিজেপি বিরোধীদের কাছে 'হিরো' বনে গেছে। তাদের প্রশস্তিতে মমতা ব্যানার্জি গ্যাসভরা বেলুনের মতো ফুলে ফুলে উঠছেন আর নিজেদের অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয় বা ওই রকম আর সেসব বাহুবলী শব্দ আছে সেই রকম নিজেকে ভাবা শুরু করেছেন। তার ফলে আজ ত্রিপুরা, কাল গোয়া, পরশু উত্তরপ্রদেশ অর্থাৎ যেখানে যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে সেখানে গিয়ে নৃত্য শুরু করেছে। যেমন ধরুন ত্রিপুরার কথা— সেখানে গিয়ে একবারে মুখ পুড়েছে। তারপর গোয়া। সেখানেও সবে আসনপিঁড়ি হয়ে বসার সময়ই গোয়ার মানুষ বেসুরো গাইতে শুরু করেছে। এবারে লক্ষ্য উত্তরপ্রদেশ। এই উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য একমাত্র অখিলেশ যাদব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হচ্ছেন বলার

চেয়ে বলা ভালো তিনি মোড়লি করার জন্য আগবাড়িয়ে অখিলেশকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মাননীয়াকে এখন আর অনেকেই বিশ্বাস করছেন না। যেমন বিশ্বাস করছেন না উদ্ধব ঠাকরে, অরবিন্দ কেজরিয়াল, কংগ্রেস এবং আরও অনেকে।

এই শরণাপন্নদের মধ্যে যেমন আছেন বিজেপি, কংগ্রেস থেকে আসা নেতা-নেত্রীরা, তেমনি আছেন অন্যান্য দল-সহ সিপিএম থেকে আসা তথাকথিত বিপ্লবীরা। কেন তাঁরা আসছেন? তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী— 'ওই সমস্ত দলে থেকে জান কবুল করে ঠিকমতো জনগণের সেবা করা যাচ্ছিল না তাই তৃণমূলে আগমন। এদলে থেকে কাজ করার প্রচুর সুযোগ আছে।' কিন্তু তাঁদের কথা শুনে আমজনতা বলাবলি করছেন এই বলে যে— 'বিজেপিতে কাটমানি নামক প্রকল্প নেই। ওখানে থাকতে গেলে এক নম্বরি হয়ে থাকতে হবে। দু' নম্বরি, তিন নম্বরি বা তার অধিক নম্বরির প্রত্যাশী যারা তাদের জায়গা নেই। আর অন্যান্য দলের অবস্থা আরও করুণ। কাজেই চল যাই 'ঘাষ ফুলে।' সেখানে অনেক কাটমানি প্রকল্প আছে।' কাটমানি প্রকল্প কী এবং তাতে জনগণের লাভালাভই-বা কীরকম তা সাধারণ মানুষ জানেন, সেইজন্য এখানে আর উল্লেখ করলাম না।

অনেকেই মনে করছেন, বিজেপি দলের মন্ত্রী-বিধায়কেরা দল ছাড়ার কারণে উত্তরপ্রদেশ ভোটে বিজেপির খুব ক্ষতি হবে। কিন্তু উত্তর প্রদেশবাসী যদি যোগীজীর উন্নয়ন, শাসনপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করেন এবং নিজেদের নিশ্চিন্তে বসবাসের চিন্তা মাথায় রাখেন তাহলে যোগীজীকেই তাঁরা ক্ষমতায় নিয়ে আসবেন। যোগীজীর শাসনের মূলনীতি— দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। হিন্দুদের ওপর সন্ত্রাসী লেলিয়ে দেওয়া নয়। তাঁর এই শাসনের জন্যই কয়েকমাস আগে সেখানকার এক মসজিদের সিঁড়ির নীচে কুঠরি ভেঙে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ তরবারি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে সে দৃশ্য দেশবাসী-সহ বিশ্ববাসী দেখেছেও। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, একটা সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থলে কেন এক বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হয়েছিল?

এ প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চিতভাবে বলা যায়--- যে ধর্মের উপাসনাগৃহে অস্ত্রভাণ্ডার পাওয়া গিয়েছে সেই ধর্মের বাণীই হলো বিধর্মী বা কাফের নিকেশ কর। তার জন্যই এই অস্ত্রভাণ্ডার। যোগীজীকে যদি উত্তরপ্রদেশবাসী পুনরায় ক্ষমতায় বসান তাহলে তিনি আরও অনেক উপাসনাস্থল থেকে খুঁজে খুঁজে ওইরকম অস্ত্রসম্ভার উদ্ধার করবেন তা নিশ্চিত করে বলা যায়। আর সেখানকার জনগণেরও ভাবা দরকার যে আগে জীবনরক্ষা তারপর রাজনীতি। জীবনই যদি গুলি-তরবারির আঘাতে চলে যায় তাহলে রাজনীতি কীভাবে করা যাবে? উত্তর প্রদেশবাসীর আরও মনে রাখতে হবে, অল্প কিছুদিন আগে হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদুদ্দিন বলেই দিয়েছেন— 'যোগী-মোদী চলে গেলে ওদের বাঁচাবে কে?' যোগীজীর মূল লক্ষ্য বাহুবলী আর সন্ত্রাসবাদী নিকেশ। আর এদের প্রতি যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহানুভূতি আছে তারাই যোগীজীর বিরুদ্ধে নৃত্য প্রদর্শন করছে।

পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি এখন দেশি-বিদেশি সন্ত্রাসবাদীতে ভরে গেছে শাসকদলের প্রশ্রয়ে। এখানে হত্যা, সন্ত্রাস, হিন্দুনারী অপহরণ, ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিরোধী দলের বিশেষ করে বিজেপি দলের নেতা-কর্মী বা সমর্থকদের এখানে কোনো কথা বলারই অধিকার নেই। তাই তো দেখা গেছে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অপরাধে বিজেপির নেতা-কর্মী, সমর্থক এবং সাধারণ নাগরিকদের সম্পদ লুঠ থেকে নারী ধর্ষণ, হত্যা, গৃহছাড়া এমনকী রাজ্যছাড়া হতে হয়েছে। উপরন্তু মুখ্যমন্ত্রী যখন স্বয়ং বলেন— 'মাদ্রাসার ছাত্রদের লাগিয়ে দাও, ওরা খুব সাহসী।' কিংবা মন্ত্রী যখন বলেন 'মারো শালে কো।' তখন এরাজ্যে শাসকদলের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীরা বিরোধীদের ওপর আরও বেশি করে আক্রমণ হানতে উৎসাহ পায়।

একুশের বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যখন এরাজ্যে ভোট প্রচারে এসেছিলেন তখন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যাঁকে আমরা আগে অগ্নিকন্যা বলে সম্বোধন করতাম তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জ্বালাময়ী যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা রাজ্যবাসী এখনও ভোলেনি। তার মধ্যে থেকে দু' একটি শব্দবন্ধ উল্লেখ করলাম, যেমন— বহিরাগত, নাড্ডা ফাড্ডা গাড্ডা ভাড্ডা, হোঁদল কুতকুত বা এরকম আরও উতভট শব্দ। ১৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে দেশের একটি অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে মমতা ব্যানার্জির সুধাবচন ছিল— 'তুই, তুমি কে ভাই? দাঙ্গাবাজ, হরিদাস, গণতন্ত্রের থাপ্পড়, কান ধরে ওঠবোস, কোমরে দড়ি বেধে ঘোরাতে পারি ইত্যাদি শব্দ যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ছিল। তাঁর এই সমস্ত শব্দবন্ধের প্রয়োগের কথা মনে হয় উত্তর প্রদেশবাসী এবং দেশবাসী এখনও ভুলে যাননি।

যাই হোক, তিনি বা তাঁর ভাইপো উত্তরপ্রদেশে ভোট প্রচারে গেলে কোনো দোষ নেই। কেননা উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের মতো ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য এবং ওই রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দল বিজেপি ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী। দেশের যে কোনো রাজ্যের লোক যে কোনো রাজ্যে যেতে পারেন তাতে কোনো বাধা নেই। উপরন্তু অন্য রাজ্য থেকে বিজেপি শাসিত রাজ্যে কেউ গেলে তাকে অতিথি হিসেবেই গ্রহণ করা হয়, গালমন্দ করা হয় না। তাছাড়া, মোদীজীর যেমন না আছে কোনো পুত্র, না আছে ভাইপো বা আর কেউ। তেমনি যোগীজীরও না আছে পুত্র-কন্যা, না আছে ভাইপো বা পরিবার। তাঁদের দুজনেরই অর্থ মজুতের কোনো প্রশ্নই নেই। তাঁরা নিরামিষাশী, সাধারণ খাদ্যে বিশ্বাসী। কাজেই সেই রাজ্যে মাননীয়া গেলে কিংবা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি গেলে যোগীজী কখনই তাঁদের উদ্দেশে ব্যানার্জি, ফ্যানার্জি, ভ্যানার্জি বা ওই ধরনের আর কোনো অসংসদীয় ভাষা প্রয়োগ করবেন না তা নিশ্চিত করে বলা যায়। কেন না যোগীজী একজন পরিশীলিত, সুসভ্য মানুষ। □

বীর সাভারকর ছিলেন অখণ্ড ভারতের সাধক

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

‘পাকিস্তান দাবি করেছিল হিন্দুরা! তারা দ্বিজাতিতত্ত্ব তৈরি করেছে! তারা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব দাবি করেছিল! তারা ব্যাপক সহিংসতা সংগঠিত করেছে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক দিয়েছে! ভারত ভাগ করেছিল হিন্দুরা!’

উপরের কথাগুলো পড়ে অবাক হচ্ছেন তো? হওয়ারই কথা। এমন উদ্ভট দাবি করে বাম-কংগ্রেস-সেকুলার-বুদ্ধিজীবীরা (পড়ুন হিন্দু-ধ্বংসকারী-চক্রী-চতুররা)। এর যথার্থতা দেখা যাক :

প্রথমত, অম্বিকা বিজয় প্রশ্ন করেছিলেন, ‘যদি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আরএসএস-কে তাদের দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য নিষিদ্ধ করে থাকেন তবে আরএসএস আজও কীভাবে বেঁচে আছে এবং মোদী সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে?’

দ্বিতীয়ত, বামপন্থীরা দাবি করে যে সাভারকর বা হিন্দুরা দেশভাগের জন্য দায়ী। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বামপন্থীদের বৌদ্ধিকভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

ভারত ভাগের জন্য বীর সাভারকরকে দায়ী করা কি ঠিক? উত্তর : একেবারে না।

শশী থারুর-সহ অনেকেই বলেছেন যে সাভারকর দ্বিজাতিতত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন এবং জিন্নাহ এটি অনুসরণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে সাভারকর স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের আগেও এটি উপস্থাপন করেছিলেন।

বিষয়টি কিছু পরিষ্কার করা যাক একটি জাতি এবং একটি দেশের মধ্যে পার্থক্যের আলোচনার মধ্যে দিয়ে। একটি জাতি হলো একটি সাধারণ ভাষা, ইতিহাস, জাতিসত্তা বা একটি সাধারণ সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত মানুষের একটি সমাজ এবং অনেক ক্ষেত্রে একটি ভাগ করা অঞ্চল। একটি জাতি (নেশন) একটি জাতিগত গোষ্ঠীর (এথনিক গ্রুপ) চেয়ে বেশি প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক। নেশনকে ‘একটি সম্পূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ বা প্রাতিষ্ঠানিক জাতিগত গোষ্ঠী’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভারত ভাগ করার জন্য সাভারকর দায়ী ছিলেন না। তিনি অখণ্ড ভারতের সাধক ছিলেন। সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংরক্ষণবিহীন এক সমসত্ত্ব মেধাভিত্তিক যোগ্যতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক- সামাজিক- নাগরিক ধর্ম-বর্ণ- জাত-নিরপেক্ষ সমানাধিকার দিতে চেয়েছিলেন।

কিছু জাতিকে জাতিগত গোষ্ঠীর সঙ্গে সমীকরণ করা হয় এবং কিছু নেশন বা জাতিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংবিধানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। একটি জাতিকে একটি সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসাবেও সংজ্ঞায়িত সংবিধানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। একটি জাতিকে একটি সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসাবেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যারা তাদের স্বায়ত্তশাসন, ঐক্য এবং বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন। আন্তর্জাতিক আইনে জাতি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রদ্যোতক শব্দ।

একটি জাতি বা দেশ একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক সংস্থা বা রাজনৈতিক সত্তা। একে প্রায়শই একজন ব্যক্তির জন্ম, বাসস্থান বা নাগরিকত্বের ভূমি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এখন অভিযোগগুলো দেখি।

অভিযোগ : সৈয়দ আহমেদ খানের ৬ বছর আগে সাভারকর তত্ত্বটি (দ্বিজাতিতত্ত্ব) উপস্থাপন করেছিলেন।

প্রকৃত ঘটনা : স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ১৮৮৮ সালে মিরাটে এক ভাষণে দ্বিজাতিতত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি এবং একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য তাদের আলাদা হতে হবে।

সাভারকর ১৮৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৮ সালে তিনি পাঁচ বছরের শিশু ছিলেন। এমন কথা তিনি বললেও কে সেই বালকের কথা শুনত?

অভিযোগ : সাভারকর ১৯৩৬ সালে দ্বিজাতিতত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন।

ঘটনা : এর উত্তর উপরের অনুচ্ছেদ থেকে এমনিই বোঝা যায়। এছাড়াও, আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর মুসলিম লিগের দাবি হিসেবে এটি প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৩৬ সাল নিশ্চয় ১৯৩০-এর পরে এসেছিল!

অভিযোগ : সাভারকর দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচার করেছিলেন।

ঘটনা : মিথ্যা : তিনি সবসময় অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি পাকিস্তান

সৃষ্টিকে সমর্থন করেছিলেন কি না তা বাবাসাহেব আম্বেদকরের বইয়ে পাকিস্তান বা ভারত ভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন : হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সভাপতি শ্রী ভি দি সাভারকর সভার গৃহীত অবস্থান সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর সংজ্ঞানুসারে হিন্দু মহাসভা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল এবং একে সর্বপ্রকারে প্রতিহত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এগুলোর মানে কী আমরা জানি না। যদি সেগুলো বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি এবং প্রতিরোধ বোঝায়, তবে তা শুধুমাত্র নেতিবাচক বিকল্প এবং সাভারকর ও হিন্দু মহাসভাই বলতে পারেন যে এই উপায়গুলি কতটা সফল হবে।

আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে যে সাভারকর জিন্নাহ 'এক জাতি' বনাম 'দুই জাতি' ইস্যুতে একে অপরের বিরোধিতা করার পরিবর্তে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করতেন। উভয়েই একমত, শুধু একমত নয় বরং জোর দিয়ে বলেন যে ভারতে দুটি জাতি রয়েছে— একটি মুসলমান এবং অন্যটি হিন্দু। দুটি জাতি কেমনভাবে বাস করবে তার শর্তাবলী নিয়েই তাঁরা ভিন্নমত ছিলেন। জিন্না বলেছেন ভারতকে দুই ভাগ করতে হবে— পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান। মুসলমানদের পাকিস্তান দখল করতে হবে এবং হিন্দুদের হিন্দুস্তান দখল করতে হবে।

অন্যদিকে, সাভারকর জোর দিয়ে বলেছেন যে, ভারতে দুটি জাতি থাকলেও ভারতকে দুটি ভাগে— একটি মুসলমানদের জন্য এবং অন্যটি হিন্দুদের জন্য ভাগ করা হবে না; দুটি জাতি একই দেশে বাস করবে এবং একটি সংবিধানের ছত্রছায়ায় বসবাস করবে; সে সংবিধান এমন হবে যে হিন্দু জাতি একটি প্রধান অবস্থান দখল করতে সক্ষম হবে যা তার প্রাপ্য এবং মুসলিম জাতি হিন্দু জাতির সঙ্গে 'অধীনস্থ সহযোগিতা'র অবস্থানে বসবাস করতে সক্ষম হবে। দুই জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ে খেলার নিয়ম হচ্ছে, যা সাভারকর নির্দেশ করেছেন, তা হলো 'এক-মানুষ-এক-ভোট, সে হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক না কেন। তাঁর পরিকল্পনায় একজন মুসলমান এমন কোনো সুবিধা পেতে পারে না যা একজন হিন্দুর থাকবে না। সংখ্যালঘুদের বিশেষাধিকার পাওয়ার কোনো ন্যায়সঙ্গত যোগ্যতা নেই এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা কোনো দোষের নয় যে তাকে শাস্তি পেতে হবে, তার কোনো ভিত্তি নেই। রাষ্ট্র মুসলমানদের তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক শক্তির নিশ্চয়তা দেবে। কিন্তু রাষ্ট্র আইনসভা বা প্রশাসনে তাদের সুরক্ষিত আসনের নিশ্চয়তা দেবে না এবং যদি এই ধরনের গ্যারান্টির উপর মুসলমানরা জোর দেয়, তাহলে এই ধরনের গ্যারান্টিযুক্ত কোটা মোট জনসংখ্যায় তাদের যে অনুপাত তার বেশি হবে না। এইভাবে এর গুরুত্ব খর্ব করে সাভারকর মুসলমানদের এ পর্যন্ত যে সমস্ত রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করেছে তাও কেড়ে নেবেন বলেছিলেন।

তাই তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে 'সাভারকর দেশভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। সংক্ষেপে, তিনি একমত হন যে হিন্দু ও মুসলমান (অধিকাংশ) দুটি জাতি, তবুও তিনি চেয়েছিলেন যে তারা সমন্বিতভাবে এক দেশে বাস করুক'।

আম্বেদকর অবশ্যই সাভারকরের তত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তিনি লিখেছেন : 'সংবিধান এমন হবে যে হিন্দু জাতি একটি প্রধান অবস্থান দখল করতে সক্ষম হবে যা তার প্রাপ্য এবং মুসলমান জাতি হিন্দু জাতির সঙ্গে 'অধীনস্থ সহযোগিতা'র অবস্থানে বসবাস করতে সক্ষম হবে'— এটা একটা ভুল ব্যাখ্যা। তার বক্তব্য সমর্থন করে তিনি লিখেছেন : সংখ্যালঘুদের জন্য এই অবস্থান প্রদান করে সাভারকর তাঁর স্বরাজ পরিকল্পনার উপসংহারে বলেছেন : 'ভারতের মুসলমানদের সমান নাগরিক হিসেবে গণ্য করার অধিকার থাকবে, তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে সমান সুরক্ষা এবং নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু কোনো অ-হিন্দু সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার হরণ করবে না। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের তাদের সেই অধিকার প্রত্যাহৃত করতে পারে না যা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে তারা যে কোনো গণতান্ত্রিক ও বৈধ সংবিধানের অধীনে প্রয়োগ করার অধিকার রাখে। বিশেষ করে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়ে হিন্দুদের কৃতার্থ করেনি এবং তাই, তারা যে মর্যাদা দখল করে আছে তাই নিয়ে এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বৈধ অংশ নিয়ে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে যা তাদের আনুপাতিক হারে প্রাপ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠদের বৈধ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে মুসলমানদের ব্যবহারিক ভেটো প্রয়োগের অধিকার দান করা এবং একে 'স্বরাজ্য' বলাটা নিছক অযৌক্তিক হবে। হিন্দুরা শুধুমাত্র 'প্রভু'র বা শাসকের পরিবর্তন চায় না, ঔরঙ্গজেবকে এডওয়ার্ডের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য সংগ্রাম ও লড়াই করতে এবং মরতে তারা যাবে না, শুধুমাত্র এই কারণে যে মুসলমানরা ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠরা এখন থেকে নিজেরাই নিজেদের প্রভু হতে চায় তাদের নিজেদের গৃহে নিজেদের ভূমিতে।'

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাভারকর সমান অধিকারের পক্ষে ছিলেন। তিনি সমতা চেয়েছিলেন, ইক্যুইটি নয়। অনুচ্ছেদের বাকি অংশে, তিনি বুঝিয়েছেন সংখ্যালঘু হওয়ার অর্থ কোনো অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা নয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার অর্থ কোনো শাস্তি পাওয়া নয়।

হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন গ্রন্থে সাভারকর লিখেছেন : ভারতীয় রাষ্ট্রটি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হোক। ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে ভোটাধিকার, পাবলিক সার্ভিস, অফিস, ট্যাক্সের যে কোনও অপ্রীতিকর পার্থক্যকে স্বীকৃতি না দিতে দিন। মানুষ হিন্দু বা মুসলমান, খ্রিস্টান বা ইহুদি যাই হোক না কেন তা বিবেচনা করা হবে না। সেই ভারতীয় রাজ্যের সমস্ত নাগরিককে মোট জনসংখ্যার মধ্যে তাদের ধর্মীয় বা জাতিগত শতাংশ নির্বিশেষে তাদের ব্যক্তিগত মূল্য অনুযায়ী আচরণ করা হোক। সেই ভাষা ও লিপিকে সেই ভারতীয় রাজ্যের জাতীয় ভাষা ও লিপি হতে দিন যা জনগণের অধিকাংশই বোঝেন বিশ্বের অন্যান্য রাজ্যে যেমন হয়। যেমন ইংল্যান্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে থাকে এবং সেই ভাষা ও লিপিকে জোরজবরদস্তিপূর্বক ও বিকৃত সংকরানের সঙ্গে গুলিয়ে দিতে যেন কোনও ধর্মীয় পক্ষপাত না থাকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 'এক মানুষ এক ভোট'ই হোক সাধারণ নিয়ম। যদি এমন একটি ভারতীয় রাষ্ট্রকে বিবেচনায়

রাখা হয়, তাহলে হিন্দু সংগঠনবাদীরা হিন্দু সংগঠনের স্বার্থে সর্বপ্রথম তার প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য প্রদান করবে। আমি আমার মতো হাজার হাজার মহাসভাপন্থীর জন্য আমাদের রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই এক ভারতীয় রাষ্ট্রের এই আদর্শটিকে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে স্থাপন করেছি এবং আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত এর পরিপূর্ণতার জন্য কাজ চালিয়ে যাব। ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি অন্য কোনো মনোভাব কি এর চেয়ে বেশি জাতীয় হতে পারে? আমাদের মাতৃভূমি একটি ভারতীয় রাজ্যে মুক্ত ও একীভূত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দুত্ব তার জীবনযাত্রার অগ্রগতি বা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না যেখানে আমাদের সমস্ত দেশবাসী যে ধর্ম-জাতি-বর্ণেরই হোক না কেন তাদের সঙ্গে নিখুঁত সমতার আচরণ করা হয় এবং কাউকে অন্যের উপর কর্তৃত্ব করার অনুমতি দেওয়া হয় না বা যতক্ষণ প্রত্যেকে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জাতির প্রতি তার সাধারণ দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করে ততক্ষণ স্বাধীন নাগরিকত্বের ন্যায়সঙ্গত এবং সমান অধিকার থেকে তাকে যেন বঞ্চিত না করা হয়।'

তাঁর 'হিন্দু'-র ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক ধারণায় মুসলমানদের একীভূত করার জন্য তিনি বলেছেন : তোমরা, যারা জাতিগতভাবে, রক্তের দ্বারা, সংস্কৃতির দ্বারা, জাতীয়তার দ্বারা হিন্দুত্বের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের অধিকারী এবং আমাদের পৈতৃক বাড়ি জোরপূর্বক হিংস্রতার দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল— তোমাদের শুধুমাত্র আমাদের মাতৃভূমিকে আন্তরিক ভালোবাসা প্রদান করতে হবে এবং তাকে শুধু পিতৃভূমি নয়, পবিত্রভূমি হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং হিন্দু সমাজে আপনাকে স্বাগত জানানো হবে। এটি একটি চয়ন যা আমাদের দেশবাসী এবং আমাদের পুরানো আত্মীয়স্বজনরা, বোহরা, খোজা, মেমন এবং অন্যান্য মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারে তবে আবার সেই চয়ন যেন ভালোবেসে করা হয় (সাভারকর, 'হিন্দুত্বের অপরিহার্য বিষয়সমূহ'তে বলেছেন)।

সাভারকর বিরোধীদের একটা বড়ো ভণ্ডামি এই যে তারা বিশ্বাস করে যে তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য দায়ী, তবুও তারা এটাও মনে করে যে অখণ্ড ভারত ছিল তাঁর আদর্শ।

১৯৩৭ সালে আহমেদাবাদে হিন্দু মহাসভার ১৯তম বার্ষিক অধিবেশনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর অখণ্ড ভারতের এই ধারণা উত্থাপন করেছিলেন যে 'কাশ্মীর থেকে রামেশ্বরম, সিন্ধু থেকে অসম পর্যন্ত' 'এক এবং অভিভাজ্য থাকতে হবে।' তিনি বলেছিলেন 'ভারতীয় জাতি এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি অবিভক্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্যপরায়ণ সকল নাগরিককে নিখুঁত সমতার সঙ্গে আচরণ করতে হবে এবং জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে সমানভাবে কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতাগুলি ভাগ করে নেবে এবং প্রতিনিধিত্বও করবে হয় এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে অথবা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনুপাতে এবং জনসেবা শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে।'

এটা সত্য যে সাভারকরের হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট করেছিল কিন্তু তা পাকিস্তানের পক্ষে ছিল না।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৭ সালের ভারতীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে বিপুল বিজয় লাভ করে, হিন্দু মহাসভাকে ধ্বংস করে। যাইহোক, ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর ভারতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জঙ্গি অংশগ্রহণকারী বলে ঘোষণা করার পদক্ষেপের প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলো পদত্যাগ করে। এর ফলে হিন্দু মহাসভা কিছু নির্দিষ্ট প্রদেশে সরকার গঠনের জন্য মুসলিম লিগ এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। সিন্ধু, এনডব্লিউএফপি এবং বাঙ্গলায় এই ধরনের জোট সরকার গঠিত হয়েছিল।

সিন্ধুতে হিন্দু মহাসভার সদস্যরা গোলাম হোসেন হিদায়াতুল্লাহর মুসলিম লিগ সরকারে যোগ দেন। সাভারকরের নিজের কথায়, 'এই সত্যটি দেখুন যে কেবল সম্প্রতি সিন্ধুতে আমন্ত্রণ পেয়ে সিন্ধু হিন্দু মহাসভা জোট সরকার পরিচালনায় লিগের সঙ্গে হাত মেলানোর দায়িত্ব নিয়েছিল।'

১৯৪৩ সালে মার্চ মাসে সিন্ধু সরকার উপ-মহাদেশের প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে একটি সরকারি প্রস্তাব পাশ করে। ভারতের যে কোনো রাজনৈতিক বিভাজনের প্রতি হিন্দু মহাসভার প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও সিন্ধু সরকারের মহাসভা মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেননি, বরং তারা 'প্রতিবাদে করেই সন্তুষ্ট' ছিলেন।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু মহাসভার সদস্যরা ১৯৪৩ সালে সরকার গঠনের জন্য মুসলিম লিগের সর্দার আওরঙ্গজেব খানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

বাঙ্গলায় হিন্দু মহাসভা ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টির প্রগতিশীল জোট মন্ত্রণালয়ে যোগদান করে। সাভারকর জোট সরকারের সফল কার্যকারিতার প্রশংসা করেছিলেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে সব জায়গায় হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে এবং তাও জোট সরকারের জন্য কংগ্রেস প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেছিল যার ফলে এটি ঘটেছিল। ১৯৪৩ সালে সিন্ধুর ইসলামি সরকার পাকিস্তান গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করে। তখনও মহাসভা জোটে থাকার পরেও এর বিরোধিতা করেছিল।

দেশভাগের পরে সম্ভবত মারাঠি ভাষায় সাভারকর পাকিস্তান সৃষ্টির নিন্দা করে বলেছেন যে, দুই দিক থেকে (পাকিস্তান ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) সবুজ রং পুরো উপমহাদেশকে সবুজে রাঙিয়ে দেবে। তিনি বলেন, হিন্দুরা এটা হতে দিয়ে ভুল করেছে।

দেশভাগের জন্য সব মুসলমানকে দায়ী করাও ঠিক নয়। এর বিরোধিতা করার জন্য অনেক মুসলমান সংস্থা ছিল। এরকম একটি দল জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দ। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে সর্বদা কট্টরপন্থীরা জয়ী হয়। নরমপন্থীরা কার্যকরী ভূমিকা নিতে অপারগ হন। এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং, ভারত ভাগ করার জন্য সাভারকর দায়ী ছিলেন না। তিনি এক অখণ্ড ভারতের সাধক ছিলে। ভারতবর্ষের মধ্যে 'এক ব্যক্তি-এক-ভোট'-এর ভিত্তিতে শাসক নির্বাচন (যেখানে যেখানে ভোটের প্রয়োজন আছে সেখানে সেখানেও একই নীতি প্রযোজ্য হবে এই তাৎপর্য এর মধ্যে লুকিয়ে আছে) ও অন্য সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংরক্ষণবিহীন এক সমসত্ত্ব মেধাভিত্তিক যোগ্যতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক- নাগরিক ধর্ম-বর্ণ-জাত-নিরপেক্ষ সমানাধিকার দিতে চেয়েছিলেন, তবে দেশপ্রেম হবে অবিভাজ্য ও প্রশ্নহীন। □

সংগীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রপতন

শ্যামল পাল

অমৃতলোকে গমন করলেন সংগীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকর। লতা মঙ্গেশকর ১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ইন্দোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত দীননাথ মঙ্গেশকর একজন মারাঠি ও কোঙ্কনী সংগীতজ্ঞ এবং মঞ্চ অভিনেতা ছিলেন। তাঁর মা সেবন্তী গুজরাটি মহিলা। লতার নাম ছিল হেমা, কিন্তু পরবর্তীতে বাবার এক নাটকে লতিকার ভূমিকায় খুব দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন। তারপর থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় লতা। পরিবারের সবাই সংগীত জগতের সঙ্গে যুক্ত। তিনি সংগীতের প্রথম শিক্ষা পান বাবার কাছে। একদিন বাবা বাড়িতে এক ছাত্রকে গান শেখাতে শেখাতে একটু বাইরে যান। সেসময় ছাত্রটি তার গানের সুর-তাল ভুল গাইছিল, তখন ছোট্টো লতা এসে ছাত্রটির গানের সুর সংশোধন করে দেয়। এ দৃশ্য দেখে বাবা অবাক হয়ে যান এবং পরের দিন থেকেই তাকে গান শেখাতে শুরু করেন। শৈশবে বাড়িতে থাকাকালীন কে এল সায়গল ছাড়া আর কিছু গাইবার অনুমতি ছিল না। তাঁর বাবা চাইতেন লতা শুধু ধ্রুপদী গান নিয়েই থাকুক।

১৯৪২ সালে লতার বয়স যখন ১৩ বছর তখন তাঁর বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ফলে ছোট্ট লতা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। বাড়ির বড়ো মেয়ে হওয়ার কারণে সংসারের সব দায়িত্ব এসে তাঁর কাঁধে পড়ে। সে সময় লতা ভেবেছিলেন যে তাঁর সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। সংসারের হাল ধরার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি অভিনয় করতে শুরু করেন। প্রায় ছ' বছর তিনি অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান মাস্টার বিনায়ক। মাস্টার বিনায়কের সহযোগিতায় লতা গান ও অভিনয় চালিয়ে যান। ক্যারিয়ারের শুরুতেই অনেক বাধা এসেছিল তার। সেসময় সিনেমা জগতে মেয়েদের একটু ভারী গলার চল ছিল। এদিকে লতার গলা একেবারে সরু, তাই তাঁর গান অনেক পরিচালকের পছন্দ ছিল না। লতার মেন্টর হিসেবে গোলাম হায়দার সহযোগিতা শুরু

করেন। তিনি শশধর মুখার্জির কাছে লতাকে নিয়ে গেলে সরু গলার বাহানা দিয়ে তাঁকে বাদ দেন। ফলে গোলাম হায়দার রেগে গিয়ে শশধর মুখার্জির সামনে লতাকে বলেন যে তোমাকে দিয়ে গান করানোর জন্য ভবিষ্যতে পরিচালকরা তোমার পায়ে পড়বে। অনেক বাধাবিপত্তি পার করে তাঁকে কয়েকটি সিনেমায় গানের সুযোগ দেওয়া হয়। তিনি প্রথম গান 'জগভাউ' নামের মারাঠি ছবিতে। হিন্দি চলচ্চিত্র 'আপ কি সেবা মে' প্রথম হিন্দি গান গেয়েছেন তিনি। তারপর ১৯৪৮ সালে প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়ের 'শহিদ' ছবিতে তিনি সুযোগ পান এবং মজবুর সিনেমায় 'দিল মেরা তোড়া' গানে বিশেষ জনপ্রিয়তা পান।

গানের জগৎজোড়া খ্যাতির জন্য তাঁকে 'কোকিল কণ্ঠী' বলা হয়। তাঁর গানে মুগ্ধ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 'ভারতের নাইটিঙ্গেল' উপাধি দেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গান সারা বিশ্বেই জনপ্রিয়। তাঁর কণ্ঠ যেন জাতির কণ্ঠ। কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরের গানের সঙ্গে দেশাত্মবোধেরও বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। ভারতে জাতীয় সংগীতের পাশাপাশি এমন কিছু গান রয়েছে, যেগুলি স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বা কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী বা বীর জওয়ানের স্মরণে গাওয়া গাওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'অ্যায় মেরে ওয়াতন কি লোগো'। অনেকেই আবার লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'মা তুঝে সালামের' কথাও বলেন। কিন্তু 'অ্যায় মেরে ওয়াতন কি লোগো' গানের সঙ্গে আমাদের মন খারাপের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। ১৯৬২ সাল ভারত-চীন যুদ্ধ হয়। বহু ভারতীয় জওয়ান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করে বীরগতি প্রাপ্ত হন। যুদ্ধের দু'মাস পরে ১৯৬৩ সালের গণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উপস্থিতিতে এই গানটি প্রথম বলিদানী জওয়ানদের উদ্দেশে গেয়ে শোনান লতা মঙ্গেশকর। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গানটি ভারতীয় জনসাধারণের দেশাত্মবোধকে একটি অনন্য মাত্রা দিয়েছে।

লতা মঙ্গেশকর তাঁর কর্মজীবনে প্রতিভার জন্য অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। তিনি ১৯৬৯ সালে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হন এবং ১৯৯৯ সালে দ্বিতীয় অসামরিক সম্মাননা পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। ২০০১ সালে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা ভারতরত্ন খেতাব লাভ করেন। এই সংগীতশিল্পীকে ২০০৭ সালে ফ্রান্স সরকার তাদের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা লেজিওঁ দনরের অফিসার খেতাব প্রদান করেছে। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। যেমন, ১৯৯৭ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, ১৯৯৭ সালে মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার ১৯৯৯ সালে এনটিআর জাতীয় পুরস্কার, ১৯৯৯ সালে জি সিনে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার, ২০০৯ সালে এএনআর জাতীয় পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ নারী নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বিভাগে ৩টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং ১৫টি বাংলা চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ নারী নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বিভাগে ৪টি ফিল্মফেয়ার বিশেষ পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গান রেকর্ড করার জন্য গিনেস বুক অব রেকর্ডে তাঁর নাম ওঠে। তাঁকে ১৯৮০ সালে দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনামের সাম্মানিক নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৮৭ সালে আমেরিকার সাম্মানিক নাগরিকত্ব পান। ১৯৯০ সালে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করা হয়। ১৯৯৬ সালে ভিডিয়োকন স্ক্রিন লাইফটাইম পুরস্কার। ২০০০ সালে আই আই এফ লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার এরকম আরও বহু পুরস্কার ও সম্মানে তিনি ভূষিত। ▯

বামকাসুন্দি

সত্যি বলছি, এই চিঠি লিখতে বসেছি মনে ঘৃণা নিয়ে নয় বরং করুণা নিয়ে। ইদানীং ফিল করছি, বাম গণ্ডির মানুষগুলোর আচরণে আর ঘৃণা, ক্ষোভ কিছু হয় না। শুধু তাচ্ছিল্যভরা করুণা অনুভব করি। সেকুলারিজমের ধ্বজাধারী বামেরা নাস্তিকতার প্রমাণ দিতে গিয়ে মা সরস্বতীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ছবি এঁকেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছে। আসলে নিজের জাতিসত্তার বিরোধিতা করতে গিয়ে আর কত নীচে তারা নামবে তাদের নিজেদেরই জানা নেই।

সম্প্রতি ভারতবর্ষের ন্যাশনাল অ্যাসেট, সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি যে স্বয়ং মা সরস্বতীই ছিলেন তা সোশ্যাল মিডিয়ার ঝড়ে আমরা সকলেই টের পেয়েছি। শুধু সুরের দুনিয়া নয় আপামর ভারতবাসী শোকস্তব্ধ হয়েছে। প্রায় তিরিশ হাজার গান গেয়েছেন নিজের জীবদ্দশায়। তাঁর কণ্ঠে স্বয়ং সরস্বতী বিরাজ করতেন একথা অস্বীকার করা যায় না। আর মানুষ হিসাবে তাঁর কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, তিনি হৃদয় থেকে একজন প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী মানুষ ছিলেন। ভারতীয় হিন্দু হিসেবে গর্ববোধ করা মানুষটি উপোস করে থাকতেন যখন ভারতীয় ক্রিকেট দল ফাইনালে খেলতে নামতো। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে দেশের প্রতি তাঁর টান অনুভব করেছি আমরা। আর এইখানটাতেই চক্ষুশূল হয়েছে বামেদের। তবে এবারে তারা বড্ড বেশি নীচতার পরিচয় দিল। লতাজীর মতো মানুষের চলে যাওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়া কুরুচিকর মন্তব্যে ভরিয়ে দিল বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের (যাঁকে লতাজী পিতা সমান মানতেন) সঙ্গে একটি ছবি ভাইরাল করে। নোংরা মন্তব্য করে বামেরা সেখানেও অশালীনতার পরিচয় দিল। সত্যিই বড়ো করুণা হয় এখন এদের প্রতি। আসলে পিপিলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে।

—কাবেরী গুহ,
হরিদেবপুর, কলকাতা-৮২।

কবীর সুমনের তিড়িংবিড়িং

কবীর সুমন বেজায় চটেছেন। কারণ রিপাবলিক বাংলার এক প্রতিনিধি সাক্ষাৎকার নেবার বাসনায় তাঁকে ফোন করেছিলেন। যে চ্যানেলে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অষ্টপ্রহর গালিগালাজ করা হয় না— সেই চ্যানেলের একজন সাংবাদিকের এত বড়ো গুস্তাকি বরদাস্ত করতে পারেননি কবীর সুমন। নর্দমার ভাষায় গালাগাল দিয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি কোন জাতের শিল্পী। তবে এসব তার কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। বরাবরই তিনি বজ্জাত। জীবনের শুরুতে এক বাংলাদেশি তরুণীকে বিয়ে করার জন্য মহম্মদ ফারুক হয়েছিলেন। তারপর এক জার্মান তরুণীকে বিয়ে করার জন্য আবার সুমন চাটুজ্যে হয়ে যান। সব শেষে বাংলাদেশের শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনকে বিয়ে করার জন্য নতুন করে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হন। নতুন নাম হয় কবীর সুমন। এ প্রসঙ্গে টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বলেছিলেন, সুমন ইসলামের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। কারণ শুধু বিয়ে করার জন্য উনি ইসলামকে ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং সুমন যে আগমার্কা বজ্জাত সেকথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সিপিএমকে ধরে শিল্পী হয়েছিলেন, তৃণমূলকে ধরে মৌরসি পাট্টা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন— কিন্তু কাউকে ধরেই এখন আর কিছু হচ্ছে না! মানুষের মন বদলে গেছে। তাই তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছেন সুমন।

—আদিনাথ যশ,
বর্ধমান।

কালাপাহাড়ের প্রকৃত পরিচয়

চালুক্য নৃপতি মুকুন্দদেব হরিচন্দনের রাজত্বকালে ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশায় পঞ্চমবারের মুসলমান আক্রমণকারী এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংসকারীর মধ্যে ঐতিহাসিক ভাবে সে নামটি বিশেষভাবে পরিচিত, তিনি হলেন কালাপাহাড়। বাঙ্গলার আফগান শাসক সুলেমান কার্নির সেনাবাহিনীর জনৈক সহকারী হিসেবে নিযুক্ত কালাপাহাড় ওই আফগান অভিযানে কার্নিপুত্র বায়াজীদের নেতৃত্বে সিকান্দর ও উজ্‌বেগের সহকারী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই কালাপাহাড়কে কেন্দ্র করে প্রচলিত বাঙ্গলার ইতিহাসে বলা হয়েছে, তিনি আগে ছিলেন জনৈক এক ব্রাহ্মণ, নাম রাজু এলিয়াসে কালাচাঁদ রায়। বাঙ্গলার সুলতানের কন্যা দুলারীর প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ করেন। বিধর্মী বিবাহ সত্ত্বেও তিনি নিজ ধর্ম রাখতে চেয়েছিলেন। তথাপি হিন্দুসমাজ গ্রহণ করেনি। ফলে তিনি ওড়িশাস্থিত পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরে যান প্রায়শ্চিত্তের জন্য, কিন্তু পুরোহিতরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলস্বরূপ কালাপাহাড়ের জন্ম হয়, যিনি হয়ে উঠেন প্রবল হিন্দুবিদ্বেষী ও প্রতিশোধ পরায়ণ, যার ফলে তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দির লুঠ ও ধ্বংস করেন। এই তথ্যটি সম্পূর্ণ রূপে একটি ধারাবাহিক ভাবে প্রচলিত মিথ যার পিছনে কোনোরকমের ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

কালাপাহাড় জন্মসূত্রেই একজন মুসলমান আফগান সেনাপতি। কালাপাহাড় কার্যত একটি পদবি বিশেষ যা বহু আফগান ব্যবহার করতেন। অওধের সরকারের জাহাঙ্গির পদাঙ্কিত বালোল লোধির ভাইপো হলেন এই জনৈক কালাপাহাড় যা তারিমী-শের-এ- শোহির চতুর্থ খণ্ডে ৩৫২ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ভাবে উদ্ধৃত। 'ওয়াগেতী-মুস্তিগীর' পৃষ্ঠা ৫৪৮-তে কালাপাহাড়কে বলা হয়েছে মিয়াঁ-মহম্মদ কালাপাহাড়। এছাড়া অন্য মতে সিকান্দরের কাছে বারবক্ শাহ পরাজিত হয়ে যখন জৌনপুর ত্যাগ করেন, তখন তিনি মহম্মদ খান ফারমোলির আশ্রয় নেন। এই মহম্মদ খান ফারমেলি কালাপাহাড় পদবি ধারণ করতেন যার তথ্যসূত্র হলো Tarik-i-khan Jahan Lodhi (Vol. P. 93) vide Briggs Ferista Vol. I. P. 560. M.A. Rahim তার History of Afglan in India AD 1545-1631 শীর্ষক গ্রন্থেও কালাপাহাড়ের ওড়িশা অভিযান ও জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস ও লুঠের বর্ণনা রয়েছে। সমগ্র মুসলমান ইতিহাসকারদের লেখায় কালাপাহাড় পুরো দস্তুর একজন আফগান এবং কখনই স্বধর্মত্যাগী হিন্দু নন।

—সৌমেন নিয়োগী,
ভবানীপুর, কলকাতা-৭০।

আমি হিন্দুত্ববাদী নই

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমানে 'হিন্দুত্ব' একটি বহুল আলোচিত বিষয়। দেশ-বিদেশের বহু পত্রপত্রিকা থেকে বুদ্ধিজীবী মহল এমনকী সাধারণ মানুষও হিন্দুত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা মত পোষণ করছেন। তাই 'আমি হিন্দুত্ববাদী নই'— এই কথাটি এখন কিছু মানুষের কাছ থেকেও শোনা যাচ্ছে। 'হিন্দুত্ব'-এর সঙ্গে 'ধর্ম' শব্দটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই আগে আমাদের জেনে রাখা দরকার 'ধর্ম' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে। 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ ধারণ করা। আমাদের এবার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কী ধারণ করা? সংস্কার, যা কিছু শুভ, যা কিছু ভালো তাই ধারণ করে 'ধর্ম'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের সচেতন থাকতে হবে, 'ধর্ম'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কিন্তু 'রিলিজিয়ন' নয়। 'রিলিজিয়ন' বলতে 'উপাসনা পদ্ধতি'কে বোঝানো হয়, ধর্মকে নয়। অবশ্যই উপাসনা পদ্ধতি ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র, কিন্তু উপাসনা পদ্ধতি মানেই ধর্ম নয়।

'হিন্দুত্ব' কী?' সহজ-সরল ভাবে বলতে গেলে হিন্দুত্ব হলো, 'জীবন পদ্ধতি'। এই জীবন পদ্ধতির মধ্যে উপাসনা পদ্ধতি-সহ সবকিছুই অন্তর্গত। অর্থাৎ যে কোনো ভাষাভাষী মানুষ, যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ, এমনকী যে কোনো উপাসনা পদ্ধতির মানুষই হিন্দুত্বের অন্তর্গত। কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন কোন ধরনের জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করলে তা হিন্দুত্বের অন্তর্গত সেটা বুঝতে পারব? আমার মতে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী নির্ভীক, কর্তব্যপরায়ণ, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ, বাস্তববাদী, সহিষ্ণু, উদার মনোভাবাপন্ন, কুসংস্কারমুক্ত, অন্যায়ের প্রতিবাদী, কর্মপরায়ণ, সচ্চরিত্রের অধিকারী, পরোপকারী, দরিদ্র বৎসল, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, দেশের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ প্রভৃতি গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের জীবন যে ভাবে অতিবাহিত করেন, তারাই হিন্দুত্বের অন্তর্গত। সমালোচক প্রশ্ন করতে পারেন, গুণের অধিকারী হিন্দু সমাজভুক্ত মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের ব্যক্তি যদি হন তাহলে কি তিনি হিন্দুত্বের অনুগামী? এর উত্তরে বলা যায় হিন্দু সমাজের ব্যক্তি না হলেও এইসব গুণের অধিকারী যে কোনো সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হিন্দুত্বের অনুগামী; তাঁর উপাসনা পদ্ধতি যাই হোক না কেন। কারণ, শাস্ত্রেই আছে, 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ সত্য এক, জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে তা ব্যাখ্যা করেন। শিবমহিম্ন স্তোত্রে আছে, 'রুচিনাং বৈচিত্র্যাদৃজকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব' অর্থাৎ 'বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলে যেমন এক সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢালিয়া মিলাইয়ে দেয়, তেমনি হে ভগবান নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশত সরল ও কুটিল নানা পথে যারা চলেছে, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।'

হিন্দুত্বের বাহিরে আমরা কেউ নই। সমালোচকরা বলতেই পারেন কেউ যদি ঈশ্বর না মানেন বা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসই না করেন তাহলে সে ব্যক্তি কী করে হিন্দুত্বের অন্তর্গত হয়? প্রকৃত হিন্দু হতে গেলে বা প্রকৃত হিন্দুত্বের অনুরাগী হতে গেলে ঈশ্বর মানতেই হবে এমন কথা কোথাও বলা নেই। হিন্দু ধর্মই একমাত্র ধর্ম যে মূর্তি পূজাকে যেমন স্থান দিয়েছে আবার নিরাকার উপাসনাকেও স্থান দিয়েছে। হিন্দু ধর্মেই ৪ ধরনের যোগের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো কর্মযোগ। কোনো ব্যক্তি যদি সারাজীবন সুকর্ম করতে পারেন তিনিও ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারবেন। তাঁর পূজার্চনা বা ঈশ্বরের বিশ্বাসের কোনো দরকার নেই। হিন্দু ধর্মই বলতে পারে, 'জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ' অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। সুতরাং যদি কেউ নিষ্কাম ভাবে কেবলমাত্র জীবের সেবা করেন, তিনিও ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে হিন্দু দর্শনে নাস্তিক বলা হয়েছে যারা বেদ মানেননি। তারা ঈশ্বর মানতেন কী মানতেন না সেই হিসেবে নাস্তিক বলা হয়নি। আর আধুনিককালে স্বামীজী যথার্থ বলেছেন, যে ব্যক্তির নিজের উপর বিশ্বাস নেই সেই নাস্তিক। যদি কেউ বলেন আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, কিন্তু তার নিজের উপর বিশ্বাস নেই; ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সে নাস্তিক। কিন্তু কেউ যদি বলেন আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস আছে; ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু আস্তিক। কারণ আমাদের শাস্ত্রে বলেছে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ।

আধুনিকতার মূল মন্ত্রই যেমন সকলকে নিয়ে চলা, ঠিক তেমনি 'হিন্দুত্ব' হলো আধুনিক তত্ত্বের অন্যতম একটি তত্ত্ব। যেখানে সকলকে নিয়ে চলার কথা বলা হয়েছে।

আবার অনেকে বলেন তিনি 'মানবধর্মে' বিশ্বাসী। তা ভালো কথা। হিন্দুত্ব ও মানবতা একে অপরের পরিপূরক। 'সর্বভূতে ব্রহ্মের' অস্তিত্বের মধ্যেই মানবতার কথা বলা হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, কেউ যদি প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য কাজ করে তিনিও নিজের অজান্তে ব্রহ্মের উপাসনা করছেন। আবার যিনি সবাইকে সমানভাবে দেখছেন অর্থাৎ কেবলমাত্র সম্প্রদায়গত ভেদভাব রহিত নয়, উচ্চনীচ ভেদভাব রহিত করে সত্যিকারের মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন, তিনিও নিজের অজান্তেই ব্রহ্মের অনেক কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন। বর্তমানকালে লিঙ্গবৈষম্য দূরের কথা খুব বলা হয়। এর ধারণাও হিন্দুত্বেরই অন্তর্গত। একজন সন্ন্যাসী তখনই প্রকৃত সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেন, যখন নারী-পুরুষকে সমান চোখে দেখেন। কারণ উভয়েই ব্রহ্মের রূপ।

সুতরাং অজ্ঞেয়বাদী, ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, যুক্তিবাদী, ভক্তিবাদী, মানবতায় বিশ্বাসী, নিরাকার উপাসনায় বিশ্বাসী, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মূর্তি পূজারি, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি যে পথেরই মানুষ হোন না কেন, প্রত্যেকেই হিন্দুত্বের অন্তর্গত। আধুনিকতার মূল মন্ত্রই যেমন সকলকে নিয়ে চলা, ঠিক তেমনি 'হিন্দুত্ব' হলো আধুনিক তত্ত্বের অন্যতম একটি তত্ত্ব। যেখানে সকলকে নিয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। □

হিজাব স্কুল ইউনিফর্ম নয়

স্কুল ইউনিফর্ম কি শালীনতা রক্ষায় যথেষ্ট নয়? ইউনিফর্মের বদলে হিজাব পরলে তো ইউফর্মটাই পালটে গেল।

অনামিকা দে

হিজাব। একটুকরো কাপড় তাতে নাক, মুখ, মাথা, বুক ঢাকা। বাইরে থেকে দেখে সাধারণত যা মনে হবে তা হলো নারীর মুখ ও শরীরের কিছুটা অংশকে আলাদা ভাবে ঢেকে রাখা যাতে অন্য মানুষ দেখতে না পায়। শালীনতাবোধের নিশ্চিত মানদণ্ড হিসাবে মুসলমান মেয়েরা বয়ঃসন্ধির পর থেকেই এই নকাব পরে। তা পরুক। তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু স্কুল-কলেজ তো তার উপাসনাস্থল নয়! এটা প্রথম প্রশ্ন, আর দ্বিতীয়টি হলো, এতদিনের যে নিয়ম— 'স্কুল ইউনিফর্ম', তাতে শুধু মুসলমান মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে হবে— এটা কোথাকার জোরজুলুম।

আরবিতে হিজাবের অর্থ হলো 'একটি অন্তঃপট বা পর্দা' এবং কোরানে বিভাজন নির্দেশ করতে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোরানে বলে মুসলমান পুরুষরা মহম্মদের স্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে একটি পর্দার আড়াল থেকে। এই পর্দা পুরুষদের দায়িত্বের অংশ ছিল, মহম্মদের স্ত্রীদের নয়। এই থেকে অনেকে দাবি করে কোরানে ইসলামি নবি সাহেবের স্ত্রীদের হিজাব ব্যবহারের নির্দেশ থাকলেও সাধারণ নারীদের নেই। যদিও বর্তমানে 'হিজাব' মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষ কর্তৃক নারীদের নিয়ন্ত্রণ করার একটি উপায়ও বটে।

২০১৩-র ১ ফেব্রুয়ারি থেকে নাজমা খান নামে একজন মুসলমান নারী বিশ্ব হিজাব দিবস পালন শুরু করে। দিবসটি বিশ্বব্যাপী সকল হিজাব পরিধান করা মুসলমান নারী পালন করেন।

শালীনতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হিজাব পরিধানের জন্য কর্ণাটকে স্কুলের ছাত্রীরা এখন আন্দোলনে নেমেছে। প্রশ্ন হলো, স্কুল ইউনিফর্ম কি শালীনতা রক্ষায় যথেষ্ট নয়? ইউনিফর্মের বদলে হিজাব পরলে তো ইউফর্মটাই পালটে যাবে। আর এরকমও তো নয় যারা এই নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে তারা বাইরে সবসময় হিজাব পরে ঘুরছে। বহু কলেজ ছাত্রী, সমাজের প্রতিষ্ঠিত মুসলমান নারীরা এই বিতর্কে নিজেদের মত দিয়েছেন। সকলেই স্কুলে হিজাব পরার পক্ষে। ওঁদের হিজাব পরার বিপক্ষে আমরাও নই। কারণ ওদের বিশ্বাস, ওদের স্বাধীনতা, সেখানে আমরা তার বিরুদ্ধে কথা বলব না। কিন্তু স্কুলের ইউনিফর্ম পালটে দেওয়ার অবশ্যই আমরা বিপক্ষে। 'স্কুল ইউনিফর্ম' স্কুলের সকলের জন্যই সমান হওয়া উচিত। স্কুল কলেজে সকলেই ছাত্র-ছাত্রী। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান বা খ্রিস্টান নয়। সকলে সমান। তবেই তো হবে প্রকৃত শিক্ষার বিকাশ। শিক্ষক শিক্ষিকারাও প্রত্যেককে সমান ভাবে দেখে থাকেন। একরূপতা আনার জন্য স্কুলে নির্দিষ্ট ইউনিফর্মের প্রচলন। অথচ এই যুক্তিগুলোর কোনো কিছুই না বুঝে গলা ফাটিয়ে বেশ কিছু তরুণী রাতারাতি সোশ্যাল মিডিয়ার বিখ্যাত হয়ে গেল। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিখ্যাত হওয়ার যেমন সুযোগ আছে তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত অনেককিছুই সেখানে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন ওই মুস্কান বলে মেয়েটি হিজাব পরিধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে গলা ফাটাচ্ছে অথচ নিজের প্রোফাইলে হিজাব ছাড়া ছবিই পোস্ট করেছে। একা মুস্কান নয় এরকম অনেক উদাহরণ আছে। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে, রাতারাতি সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য হিজাব পরে ক্যামেরার সামনে আন্দোলনে নামা এই তরুণীরা আদতে হিজাবের খুব একটা ধার ধারে না।

কর্ণাটকের আদালত অবশ্য জানিয়েছে যতদিন না হিজাবের পক্ষে কোনো আইন বলবত হচ্ছে ততদিন সকল ছাত্রীকে স্কুল ইউনিফর্মই পরতে হবে। কর্ণাটকের শিক্ষামন্ত্রী বিসি নাগেশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, হিজাব পরে ছাত্রীদের স্কুলে বা কলেজে যাওয়াটা সমর্থনযোগ্য নয় এবং এটি তাদের নিয়মানুবর্তিতার বিরুদ্ধে যায়। স্কুল-কলেজ ধর্ম পালনের স্থান হতে পারে না। এই গোটা ঘটনায় যেটি আমায় খুব প্রভাবিত করেছে তা হলো কর্ণাটকের স্কুল কলেজের ছেলেরা খুব সুন্দর ভাবে এই বৈষম্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারা গেরুয়া উত্তরীয় গলায় নিয়ে স্কুলে গেছে যদিও সেটিকেও আমি ইউনিফর্ম হিসেবে সমর্থন করছি না। এখানে একটা কথা পরিষ্কার, নিয়ম সবার জন্য এক হওয়া উচিত। স্কুলজীবনে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা অর্জন করতে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যায় তা তো নয়! সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা হয় ছাত্রজীবনে। স্কুলের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ। ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে অন্তত স্কুলের গণ্ডিটাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব এই প্রত্যাশা থাকা উচিত আমাদের। তাই যারা এর সমর্থনে হাত তুলেছেন তা সে হিন্দু হোক বা মুসলমান, দয়া করে এক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠে মানুষ হতে সাহায্য করুন শুধু একবার ভেবে দেখবেন ছাত্রজীবনের ধর্ম কী? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''মহাপুরুষেরা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না।' এরপর অন্তত হিজাব পরার পক্ষে হাত তোলার আগে আমাদের সকলকেই একবার ভাবতে হবে। □

পিরিয়ডসের সময় ওজন বৃদ্ধির কারণ ও সমাধান

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

মহিলাদের শরীরে পিরিয়ডের জন্য দুটি হরমোন মূলত দায়ী, ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন। এর ওঠানামার ফলেই পিরিয়ডস হয়। অনেকেরই এর আগে থাকতে নানারকম সমস্যা হয়। কারও ক্লাস্টার হেডেক, মাইগ্রেন বাড়ে। হয়তো কারও স্তনে ব্যথা হয়। অনেকের আবার ওজন বাড়ে। নিয়মিত শরীরচর্চার পরেও দেখলেন ওজন হয়তো আগের সপ্তাহের তুলনায় খানিকটা বেড়ে গেছে। ক্যালেন্ডারে দেখুন তো আপনার পিরিয়ডসের সময় হয়ে যায়নি তো? আপনার ক্ষেত্রে যদি এই ঘটনা পরিচিত মনে হয়, তাহলে জেনে রাখুন তো আপনি একা নন অনেকের ক্ষেত্রেই এই সমস্যা হয়। পিরিয়ডসের আগে বা পরে ওজন একটু বেড়ে যাওয়া একটি সাধারণ ঘটনা বলেই চিকিৎসকরা মনে করেন, যা কিছু দিন পরে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কেন বাড়ে ওজন?

পিরিয়ডসের আগে শরীরের ওজন বেড়ে যায় মূলত জল জমার কারণে। এই সময়ে প্রধান দুটি হরমোন ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের মাত্রা দ্রুত কমে যায়। আকস্মিক এই হরমোনগুলি মাত্রা কমে যাওয়া থেকে শরীর পিরিয়ড শুরু করার আগাম সংকেত পায়। শরীরের ইলেকট্রোলাইটসের ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্বও এই দুই হরমোনের। ফলে ওগুলির মাত্রা কমে গেলে ইলিকট্রোলাইটসের ভারসাম্য গোলমাল হয়ে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। শরীরের বিভিন্ন কোষের জল জমলেও মূলত স্তন আর তলপেটেই বেশি করে জল জমে।

তবে এটা জল, চর্বি নয়। কাজেই এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। পিরিয়ডস শেষ হওয়ার দিন তিনেকের মধ্যে হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে অতিরিক্ত জলও দূর হবে।

এছাড়াও জল জমার আরও একটি কারণ হলো এসময়ে বিভিন্ন রকম অস্বাস্থ্যকর কমফোর্ট ফুড খাওয়া হয়। এর কারণ হলো প্রোজেস্টেরণ হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়া। সেজন্য চিনি ও ক্যালোরিযুক্ত খাবার খাওয়ার কারণে ওজন বাড়ে।

কতটা বাড়তে পারে?

এসময়ে একজন মহিলার ওজন দু' কেজি বাড়তে পারে। তবে পিরিয়ডস শেষ হলে সেটা কমে যায়, কেননা শুরু থেকে চারদিন আগে শরীরের ওজন অল্প অল্প করে বাড়তে শুরু করে। আর শেষ হওয়ার দু-তিনদিনের মধ্যে তা কমে যায়। অনেকের ওজন বৃদ্ধির সমস্যা ছাড়াও এসময়ে হতাশা, মানসিক অস্বস্তি, অনিদ্রা, মাথাব্যথা, অবসাদ, সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনীহা, স্তনে স্পর্শকাতরতা দেখা যায়, যা সবই স্বাভাবিক।

কীভাবে হবে সমাধান?

মুখরোচক খাবার খেতে ইচ্ছে হলে অল্প পরিমাণে খান, বেশি খেয়ে অযথা ওজন বাড়িয়ে ফেলার কোনও মানে নেই। কাজেই সেই ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেবেন না। প্রচুর জল পান করতে হবে। এতে ইলেকট্রোলাইটসের ভারসাম্য বজায় থাকবে, বিশেষ করে ওআরএস, ডাবের জল।

ফাইবারযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত যাতে বাওয়েল মুভমেন্ট ঠিক থাকে, তাহলে অতিরিক্ত ইমপালসিভ ইটিংয়ের দিকে মন যাবে না।

নুন খাওয়া কমাতে হবে, কেননা নুন শরীরে জল ধরে রাখে। যতটুকু পারবেন শরীরচর্চা করুন, হতে পারে মধ্যম মাত্রার হাঁটা, কেননা এই সময়ে ভারী শরীরচর্চা করতে পারবেন না। এ বিষয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিছুটা সাহায্য করতে পারে। □

ইংলিশ মিডিয়াম বাঙ্গালির ভিড়ে কোণঠাসা কলেজ স্ট্রিট

বাংলাভাষার উন্নয়নে অন্যতম কাণ্ডারি হলো প্রকাশক মহল। এমনকী সংবাদপত্র-পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষও। তাদেরও সমান দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের বঙ্গসন্তানদের মাতৃভাষার আঁচল যাতে খসে না পড়ে সে ব্যাপারে সুরক্ষকের ভূমিকা নিতে।

সুজিত রায়

দিন আগতপ্রায়। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি এপার বাঙ্গলা এবং ওপার বাঙ্গলার পথঘাট, আঙিনা, সবুজ ধানের খেত জুড়ে বয়ে যাবে সেই চিরন্তন ভালোবাসার গান, শ্রদ্ধার গান, সম্মানের গান :

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী,
আমি কি ভুলিতে পারি?
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায়ে
ফেব্রুয়ারী,
আমি কি ভুলিতে পারি?
আমার সোনার দেশের রক্তে
রাঙানো ফেব্রুয়ারী,
আমি কি ভুলিতে পারি?

কিংবা সেই চোখের জল ঝরানো পঙ্‌ক্তিগুলো, রক্তে মাতাল ঝড় তোলার স্বর্ণাক্ষরগুলি :

জাগো নাগিনীরা জাগো
নাগিনীরা জাগো
কালবোশেখীরা শিশুহত্যার
বিক্ষোভে আজ
কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে
রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে
তবু তোর পার পাবি?
না, না, না, না
খুন রাঙা ইতিহাসে
শেষ রায় দেওয়া তারই,
একুশে ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি।

প্রাথমিক ভাবে ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ওপার বাঙ্গলার ঢাকা শহরের বাংলা ভাষার সাংবিধানিক মর্যাদার দাবিতে পুলিশের গুলিতে শহিদের রক্তে ভিজে মাটিতে বসে গানটি রচনা করেছিলেন আবদুল গফফ্‌র চৌধুরী। সুরারোপণ করেছিলেন আবদুল লতিফ। পরে ১৯৫৪ সালে নতুন করে সুরারোপ করেন আলতাফ মামুদ। সেই সুরটিই এবং বাংলা ভাষা দিবসের প্রাতিষ্ঠানিক সুর এবং দুই বাঙ্গলা ২১ ফেব্রুয়ারির সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রতীকী সংগীত।

আজ শুধু বাঙ্গলায় নয়— হিন্দি মালয়, ইংরেজি, ফরাসি, সুইডিশ, জাপানি-সহ মোট ১২টি ভাষায় গাওয়া হয় :

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে
শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে,
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা
অলকানন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক ঝড় এল
খ্যাপা বুনো।।
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের
ভায়ের চরম ঘৃণা।
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে
দেশের দাবিকে রোখে।
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার

বুকে।
ওরা এদেশের নয়
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়,
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি,
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী।।

সেদিনের বাংলা ভাষার মুক্তি, বাংলা ভাষার সম্মানের দাবিতে পাকসেনার অক্রমণকে পদদলিত করে বাঙ্গালির এই আন্দোলন মঞ্চ থেকে ডাক এসেছিল মানুষের কাছে—

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশ ফেব্রুয়ারী,
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী।
আমার শহিদ ভায়ের আত্মা ডাকে,
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে হাটে।
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালতো ফেব্রুয়ারী,
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী।।

জেগে ওঠে শহিদ সালাম, বরকত, রফিক জব্বারের আস্থা। ব্রিটিশ চক্রান্তে বিভাজিত বাঙ্গলার আত্মা একাত্ম হয়ে ওঠে মাতৃভাষার সাংবিধানিক সম্মানের দাবিতে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫১ সালে ইসলামিক পাকিস্তান বাংলা ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

বাংলা ভাষা আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক সরণীর আন্দোলন আজ পরিণত অনেকটাই আনুষ্ঠানিক প্রথায়। আবেগ উদ্বেগ ওপার বাংলায় যদি-বা কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে, এপার বাঙ্গলায় তা কতটা রয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক আছে যথেষ্ট। এই প্রবন্ধে এখন চেষ্টা করব তুলে ধরতে সেই প্রসঙ্গটাই— বাংলা ভাষা তথা মাতৃভাষার অস্তিত্ব বজায় রাখতে ও সম্মান প্রদর্শনে এপার বাঙ্গলার আগ্রহ কতটা?

প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে— বাংলা ভাষার উদ্ভব মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে পালি, প্রকৃত ইত্যাদির ধারাবাহিকতার স্রোত বেয়েই। অতীতের সেই বাংলা ভাষা নিয়ে যুগ-যুগান্তর ধরে হয়েছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা, সমালোচনা, বিতর্ক এবং সংশোধনী ও উন্নয়নসূচক কার্যকলাপ। এমনকী বিংশ শতকে প্রথমে বিদ্যাসাগর পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলা ভাষাকে সরল ও সহজ বোধ্য করে তুলতে কম অবদান রাখেননি। প্রায়

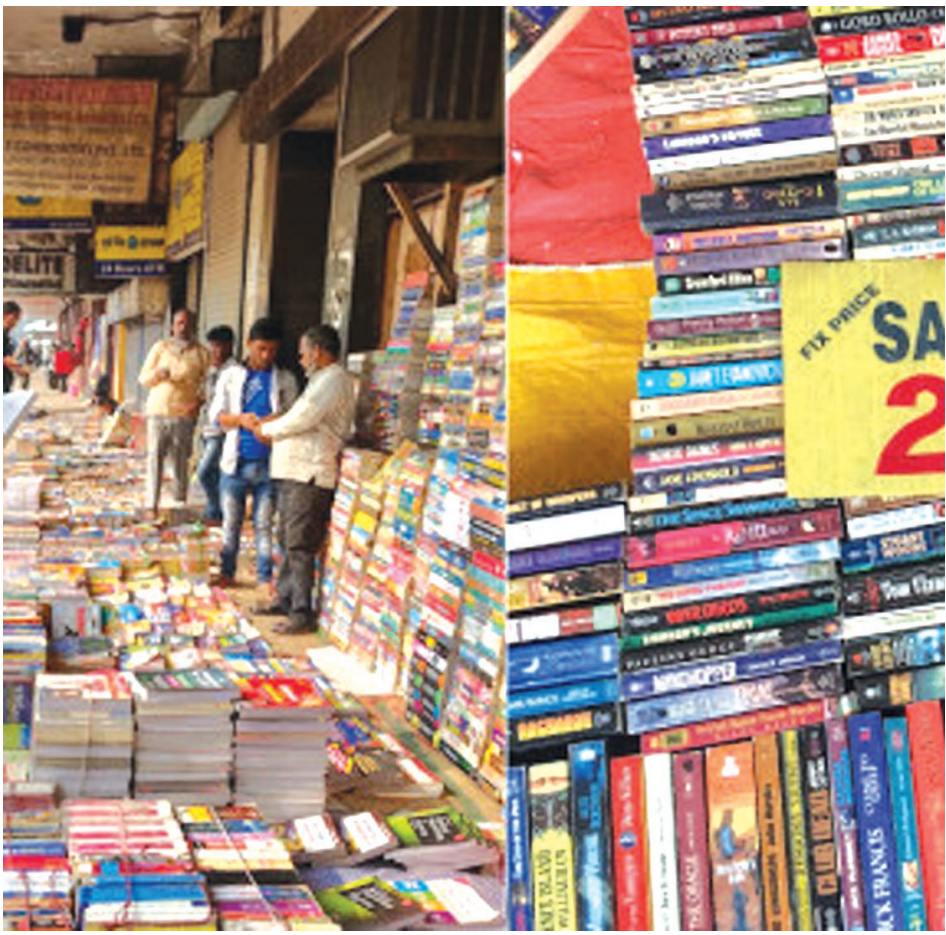

সমসাময়িক সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে। এই সংশোধনের ইতিহাসও দীর্ঘ। কালের বিবর্তনে বাংলা ভাষা আজ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তারও রূপ সম্পূর্ণ নয়। কারণ ভাঙাগড়ার খেলা আজও অবিরাম চলেছে এবং তা বোঝা যায় যখন কলকাতার সীমান্ত পার হয়ে প্রবেশ করা যায় জেলাগুলির অভ্যন্তরে। এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ভাষার উন্নয়নে এই প্রচেষ্টা চলতে থাকুক। প্রশ্ন হলো— এই পরিবর্তনের ফল আমরা কতটা বাস্তবসম্মত ভাবে আত্মস্থ করতে পারছি বা ভাবছি বাংলা ভাষার উন্নয়ন আর কোন পথে সম্ভব।

এ নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যুগে যুগে নানা কথা বলে গেছেন। আমরা সেসব উদ্ধৃতি সচেতন ভাবে আপাতত পরিহার করে চলুন নিজেদের মতো করে বিচার বিবেচনা করি।

এই বিচার বিবেচনায় আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে নিজেদের বিবেক, বোধ এবং আত্মার কাছে কয়েকটা সহজ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া। সেগুলি হলো :

১। আমরা আক্ষরিক অর্থে বাংলাভাষা বলি কতটা?

২। আমরা বাংলা বই পড়ি কতটা?

৩। আমরা বাংলাভাষা নিয়ে ভাবি কতটা?

৪। বাংলা, বাঙ্গালি ও বাংলাভাষার ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী কতটা?

৫। বাংলাভাষার উন্নয়নে আন্দোলনমুখী কর্মসূচি নিয়ে থাকি কতখানি?

সহজ সরল এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যদি আন্তরিক ভাবে সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে বলা হয় তাহলে তা দাঁড়াবে এরকম :

১। আমরা গড় বাঙ্গালিরা যে বাংলা বলি তা এক মিশ্র ভাষা। এই ভাষায় অবিরাম মিশে থাকে ইংরেজি ও হিন্দি। কখনও কখনও ওড়িয়া ও উর্দু। ফারসিও। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে বাংলা বলার অভ্যাসটা জন্মগত ভাবেই আমাদের নেই। কারণ মিশ্রভাষা আমাদের মজ্জাগত। হয়তো-বা জেনেটিক ধারাবাহিকতাও এজন্যই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অশোক মিত্রর মতো ক্ষণজন্মা শিক্ষিত মানুষটি সম্মান পেতেন বাঙ্গালি জনমানসে, কারণ উনি

যখন বাংলায় বক্তৃতা দিতেন তখন একটিও ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করতেন না। ইংরাজিতে যখন বলতেন তখন গোটাটাই থাকত শুধু ইংরেজি অন্য কোনও ভাষা নয়।

২। বাঙ্গালি ভক্ত পাঠক— এই সুনাম ছিল দীর্ঘকাল। অবক্ষয়ের সূত্রপাত এ রাজ্যের বাম আমলে যখন বামফ্রন্ট সরকার এরাজ্যে 'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা' নীতি গ্রহণ করে চেষ্টা করলেন ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি পড়াশোনা তুলে দিতে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কতটা বিজ্ঞানসম্মত, কতটা নয় তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে বামফ্রন্টের ওই নীতি 'গেল গেল' রব তুলে দিল। কারণ যে কোনো রাজ্যেই রাজ্যগত ভাষা যতই সম্মাননীয় হোক না কেন, প্রতিটি ভারতবাসীই জানে— ভারত স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ব্রিটিশ ইংলিশের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। উচ্চশিক্ষা থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়তে হলে ইংরেজি মাধ্যমই এখনও গোটা দেশে বৈতরণীর ভূমিকায়। অতএব মাভৈঃ। ছেড়ে দাও বাংলা

কয়েকজন প্রকাশকের জন্য ক্ষতি হয় বেশিরভাগের

তুষারকান্তি প্রামাণিক

কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকদের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। বিশেষ করে কোভিড পরবর্তী সময়ে এখানকার ছোটো-বড়ো সব প্রকাশকেরই একরকম নাভিশ্বাস উঠে গেছে। কিন্তু কোভিড ছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে যার জন্য কলেজ স্ট্রিটের এই হাল। একটা কথা মানতেই হবে বাঙ্গালি পাঠকের বই পড়ার অভ্যেস অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে কমেছে বই বিক্রির সংখ্যা। সেই সঙ্গে রয়েছে রাজ্য সরকারের উদাসীনতা। আগে বাংলা ব্যাকরণ এবং ইংরেজি গ্রামার বই আলাদা করে ছাপা হতো।

ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারের পরিচালনাধীন রাজ্যপুস্তক পর্ষদের কাছ থেকে টেক্সট বুক বিনামূল্যে পেলেও ব্যাকরণ বই-সহ অন্যান্য রেফারেন্স বই, দ্রুতপঠন, ওয়ার্ডবুক ইত্যাদি বাজার থেকে কিনত। ইদানীং সরকার টেক্সট বইয়ের মধ্যেই বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার ঢুকিয়ে দেওয়ায় আলাদা করে আর ওইসব বিষয়ে বই কিনতে হচ্ছে না। সরকারের এই নিয়মের জন্য রেফারেন্স বই যে-সব প্রকাশক ছাপেন তাঁদের খুবই ক্ষতি হয়েছে। কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকদের সমস্যার আর একটি বড়ো কারণ পাইরেসি।

কলকাতায় প্রকাশিত বইয়ের নকল সংস্করণ বাংলাদেশে হই হই করে বিক্রি হয়। এই বিক্রির লভ্যাংশ কলকাতার প্রকাশক পান না। এমনকী কলকাতার অনেক প্রকাশকও কলেজ স্ট্রিটে প্রকাশিত বই অসাধু উপায়ে ছেপে বিক্রি করেন। পাইরেসি বন্ধ করার কোনও উদ্যোগ আজ অবধি কোনও সরকার নেয়নি। লাইব্রেরির জন্য সরকার বছরে একবার বই কেনে। কিন্তু আমাদের মতো ছোটো প্রকাশকেরা সেই সুযোগও পায় না। কারণ কয়েকজন প্রকাশক রাজনীতির কলকাঠি নেড়ে আগে থেকে সরকারি অর্ডার বেরোবার তারিখ ইত্যাদি জেনে যান। ফলে তাদের বই বেশি বিক্রি হয়। দেরিতে জানার ফলে আমাদের কপালে ছিটেফোঁটাই জোটে। প্রকাশকদের যে সংগঠন আছে সেখানেও এইসব মাথাভারী প্রকাশকদের ভিড়। অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হয় না।

(লেখক তপস্যা প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার)

স্কুল। লাইন দিয়ে ভর্তি হয়ে যাও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে— অনেকের ভাষায় ট্যাঁশ ইস্কুলে। এই রদবদল বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। কারণ শিক্ষিত বাঙ্গালি তথা শিক্ষিত বাবা মা-রা লক্ষ্য করছিলেন বাংলামাধ্যম স্কুলগুলিতে পড়াশোনার মান ক্রমাগত নিম্নাভিমুখী। শিক্ষা ও শিক্ষকরা সকলেই রাজনীতির শিকার। অতএব রাজনীতি পেল প্রাধান্য। শিক্ষা পেল 'সেকেন্ডারি' প্রাধান্য। আর সত্যিই তো কেরিয়ারের জগৎটা তো বাংলায় অপস্রিয়মাণ। তাহলে যেতে হবে হয় ভিন রাজ্যে নয়তো বিদেশে। সেখানে ইংরেজিই একমাত্র 'কমিউনিকেশন বোট'। সুতরাং কচিকাঁচারা বাবা মা, ম্যামদের শেখানো রাইমস শিখল, বাংলার প্রচলিত ছড়া শিখল না, শিশু ভোলানোর কবিতা কী তা জানল না। ঠাকুরদার ঝুলি, ঠাকুরমার ঝুলি, বেঙ্গমা বেঙ্গমী, লালকমল নীলকমলরা অজানা ইতিহাস হয়ে গেল নবপ্রজন্মের শিশুদের কাছে। বাংলামাধ্যমের বহু স্কুলের ক্লাসরুমে এখন বট অশ্বত্থের শেকড় পরিবেষ্টিত। রবীন্দ্র রচনাবলী ড্রয়িংরুমের শোভাবর্ধনকারী।

৩। বাংলা ভাষা নিয়ে ভাবনা ছেড়ে দিয়েছে বাঙ্গালি। একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন, বাংলার কলেজগুলিতে কটায় পড়ানো হয় ভাষাতত্ত্ব, অনুবাদ তত্ত্ব, তুলনামূলক সাহিত্য। কোটিতে গুটিক। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও নগণ্য। কারণ চাকরির বাজার এ বিষয়ে সংকীর্ণ ও সমস্যা সংকুল। অতএব আলোচনা পর্যালোচনা, বিতর্ক এসব এখন শিকেয়। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এখন বাংলাভাষা ও বাঙ্গালি নিয়ে যতটা হইচই সবটাই আপাদমস্তক রাজনৈতিক। কোনো এক বা একাধিক দল বাংলা নামক আবেগটিকে উসকে দিয়ে চলেছেন ভোটবাক্স ভরাটের ছক্কাপাঞ্জার খেলায় মাততে। আন্তরিকভাবে এরা কেউই বাংলা ভাষার উন্নয়নে আগ্রহী নয়। যেটুকু হচ্ছে সবটাই কাগজে কলমে। তাই বাংলা আকাদেমিও এখন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ছত্রছায়ায় লালিত।

৪। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় খোঁজ নিয়ে দেখবেন— বাংলা বাঙ্গালি ও বাংলা ভাষা নিয়ে যে গুটিকতক ইতিহাসসমৃদ্ধ বই রয়েছে সেগুলির বিক্রিবাটা কেমন। শুনলে আপনাকে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে পালিয়ে আসতে হবে। একমাত্র ছাত্র ও শিক্ষকরা যারা এ বিষয়ে পড়াশোনা করছেন, পরীক্ষায় বসছেন— কিনছেন তাঁরাই। গড় বাঙ্গালির ইতিহাস জানার আগ্রহ নেই। ভাবটা এমন— জেনে কী লাভ? কাজে তো লাগবে না। যেহেতু বাংলা কর্মসূচি ভাষা নয় তাই তার ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী নন গড়পড়তা বাঙ্গালি। যেমন তাঁরা আগ্রহী নয় আপন পিতৃপুরুষদের ইতিহাস জানতেও।

৫। একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, ওপার বাঙ্গলায় বাংলাভাষার উচ্চারণ এপার বাঙ্গলার থেকে কত বেশি স্পষ্ট ও সঠিক। কত বেশি তাঁরা সমৃদ্ধ বাংলা শব্দবৈচিত্র্যে এবং কত বেশি সচেতন বাক্যের ব্যবহারে। শুনলেই মনে হয়— এটাই তো বাংলা। এই প্রভাব বাংলাদেশের লেখনী শক্তিতেও। উপন্যাস থেকে কবিতা, প্রবন্ধ থেকে সংবাদ--- সব লেখাতেই বাংলাভাষায় সমৃদ্ধরূপ চোখে পড়ার মতো। এর কারণ ওপার বাঙ্গলার বাঙ্গালিরা অনেকটা ইংরেজির প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছেন। লন্ডনে বসবাসকারী 'বাঙ্গাল'রা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলেন--- সেটাও সেই বাংলাই এবং কখনই তাঁরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজি কলকাকলিতে মেতে থাকেন না। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ বিদেশি ছুট ভাষা— ইংরেজি ও উর্দুর প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছেন--- তার প্রমাণ এটাই। ওখানে বাংলা আকাদেমিতে বাংলা ভাষার উন্নয়নে যত গবেষণা বাঙ্গলায় হয় তার সিকিভাব হলেও এই বাঙ্গলায় বাংলা ফিরে আসতো, না, তা হয় না। কারণ একটাই— রাজনীতি। রাজনীতির গড়ে মানুষ আর যাই হোক না কেন--- এগোনটা তাদের কাছে ব্যক্তিগত পার্থিব অগ্রগতি। দেশ বা জাতি তাঁদের কাছে দ্বিতীয় স্তরের প্রাধান্য হিসেবেই বিবেচিত।

বাংলা ভাষা চর্চা কেমন চলছে তার প্রমাণ পাবেন কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় ঢুঁ মারলেই। বই প্রকাশে কোনো খামতি নেই যেমন খামতি নেই ঠিকানাবিহীন, কুলগোত্রহীন প্রকাশকের রাতারাতি জন্ম ও মৃত্যুতেও। ফলত কলেজ স্ট্রিট পাড়ার কুলিন প্রকাশকরা যেমনভাবে সাহিত্যের বিচার করতেন, ভাষার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন, সেসব এখন অতীত। এখন যাঁরা লিখছেন, তাঁদের বেশিরভাগই বাংলা ভাষা নিয়ে যেমন আবেগপ্রবণ নন, তেমনি প্রকাশকরাও ওসব চিন্তাভাবনা শিকেয় তুলে দিয়েছেন। বানান ভুল, বাক্যের ব্যাকরণশৈলীর ভুল প্রসব এখন জলভাত। আর সাম্প্রতিকতম পরিবর্তনটি হলো— থ্রিলার। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এখন সাহিত্য পাবেন না। থ্রিলার পাবেন। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে। লেখক-লেখিকা, প্রকাশক সবাই মিলে তিন ঠ্যাং জড়ো করে খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, ভূত, প্রেত, শাঁকচুন্নি, তান্ত্রিক, মাদুলি, কবজ, অলৌকিকত্বের নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছেন বাংলা প্রকাশনার জগতে। বিক্রিবাটা মন্দ নয়। কারণ সিরিয়াস পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ কমছে।

এই মুহূর্তে উপন্যাসের বাজারে নবীন প্রবীণ মিলে রাজ করছেন ৪-৫ জন লেখক। এঁরা সাহিত্যকে ধরে রেখেছেন। বাকিরা সব উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ বলে নাম লিখিয়েছেন ওই পশ্চিমি ভাবধারায় লালিত থ্রিলারের রসে। এমনকী গোরুয়াধারী এক সন্ন্যাসী ঔপন্যাসিকও তার ব্যতিক্রম নন। এই সব থ্রিলারের একটা বড়ো অংশ আবার বিদেশি থ্রিলার থেকে 'অনুপ্রাণিত' (ঝাড়া শব্দটা এড়িয়ে গেলাম সচেতনভাবেই) এবং একজন লেখিকা তো সম্প্রতি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছেন— 'টুকেছি বেশ করেছি। রবীন্দ্রনাথও তো বিদেশি গান টুকেছেন।' শুনে মনে হয়েছিল— ধরণী দ্বিধা হও। ঠাঁই দাও পাতালের অন্ধকারে।

হ্যাঁ সত্যিই। বাঙ্গলা, বাঙ্গালি বাংলা ভাষা ক্রমশ ধাবমান ওই কবরের অন্ধকারের দিকে। সত্তরের দশকের 'ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো' গোষ্ঠী আর 'হ্যাংরি জেনারেশন যেমন কফি হাউসের দেওয়ালে কম্পন তুলে বাংলা সাহিত্যকে পালটে দিতে চেয়েছিল সেরকম এই থ্রিলারের ঢেউ আছড়ে পড়েছে বইপাড়ায়। আসন্ন কলকাতা বইমেলায়ও সেই ঢেউ যে বহমান হবে তা বলাই বাহুল্য। শেষ বইমেলায় (২০২০) বই বিক্রি হয়েছিল ৪১ কোটি টাকার। এবার যদি সমপরিমাণ বইও বিক্রি হয়— মেলা কর্তৃপক্ষের উচিত হবে— বাংলা বই বিক্রির হিসাবটা আলাদাভাবে করা। কারণ গিল্ডেরও একটা দায়িত্ব থেকে যায় বাংলা ভাষাচর্চার উন্নয়নের শরিক হতে। কারণ বাংলাভাষার উন্নয়নে অন্যতম কাণ্ডারি প্রকাশক মহল। এমনকী সংবাদপত্র-পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষও। তাদেরও সমান দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের বঙ্গসন্তানদের মাতৃভাষার আঁচল যাতে খসে না পড়ে সে ব্যাপারে সুরক্ষকের ভূমিকা নিতে।

এটাই হোক এবারের বাংলাভাষা দিবসের শপথ।

□

বইপাড়ার অর্থনীতিতে কোভিড মহামারী আমাদের মাতৃভাষাকেও সংকটগ্রস্ত করেছে

অভিমন্যু গুহ

কোভিড মহামারীতে সারা বিশ্বেই ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা অতি সংকটাপন্ন। ভারতেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই মহামারীর সুগভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং সহজবোধ্য কারণেই এর ধাক্কায় রীতিমতো বেসামাল এশিয়ার বৃহত্তম বইবাজার, বাঙ্গালির ঐতিহ্যের কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। কিন্তু এই আক্রমণ কেবল বইপাড়ার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যকেই বিপন্ন করেনি, আমাদের মাতৃভাষাকেও চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত করেছে। এর জন্য কেবলমাত্র কোভিডের ঘাড়েই সব দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ভারত-বাংলাদেশ সম্প্রীতির অজুহাতে সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট একটি সমস্যা বলা চলে।

ধাক্কাটা কতটা জোরালো তা বোঝার জন্য কলেজ স্ট্রিটের বইবাজারের চালচিত্রটাও কিছুটা জানা দরকার। কলেজ স্ট্রিটের বই ব্যবসাকে কেন্দ্র করে অপেশাদার লেখক, সম্পাদক, পুস্তক-নির্মাতা ইত্যাদি বাদ দিয়েও অন্ততপক্ষে লাখখানেক লোকের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত হয়। যাদের আজ বিকল্প আর্থিক-সংস্থানের কথা ভাবতে হচ্ছে একপ্রকার বাধ্য হয়েই। এমনিতে কলেজ স্ট্রিটের বই বাজারের অবস্থা বিগত কিছু বছর ধরেই খুব একটা ভালো নয়। কারণ ই-বুক সংগ্রহ করবার প্রবণতা বইপড়ার কর্মসংস্থানকে যে কিছুটা হলেও সংকুচিত করেছে, তা অবশ্যস্বীকার্য।

> **বাংলা বইয়ের বাজার কলেজ স্ট্রিট থেকে ক্রমশ সরে ঢাকা অভিমুখী। এর ফলে মুসলমানি বাংলা মূলধারায় আসবে এবং স্বামীজীর ভাষায় 'প্রাকৃতিক নিয়মে বলবান' হওয়া কলকাতার ভাষা মূল জায়গার দখল হারিয়ে ফেলবে।**

লোকের বই পড়ার অভ্যেস ক্রমশ কমেছে, ছাপা বইয়ের জায়গা ক্রমশ নিয়েছে ই-বুক। পাঠকের দিক দিয়ে দেখলে ই-বুকের কিছু সুবিধে অবশ্য আছে। প্রথমত, ঢাউস আলমারি জোড়া বই রাখার কোনো ঝক্কি নেই, এমনিতেই ফ্ল্যাট বাড়িতে স্থান-সংকুলানের অভাব। সেখানে কেই-বা আলমারি রেখে ক্ষুদ্র পরিসরকে আরও ক্ষুদ্রতর করতে চায়! দ্বিতীয়ত, ই-বুকের মূল্য ছাপা বইয়ের সচরাচর অর্ধেক বা ক্ষেত্রবিশেষে তারও কম হয়। কারণ ই-বুকের উৎপাদন খরচ প্রায় নেই বললেই চলে। যেহেতু এতে লেখক-পাঠকের মধ্যে সরাসরি সংযোগের একটা সেতু গড়ে ওঠে। ই-বুকের উৎপাদন খরচ শূন্য, লেখকের রয়্যালটি বাবদ ও পেজ সেটিঙে যা কিছু ব্যয় হয়। প্রকাশকরাও তাই মোটামুটি প্রযুক্তিজ্ঞান-সম্পন্ন হলেই ছাপা বইয়ের

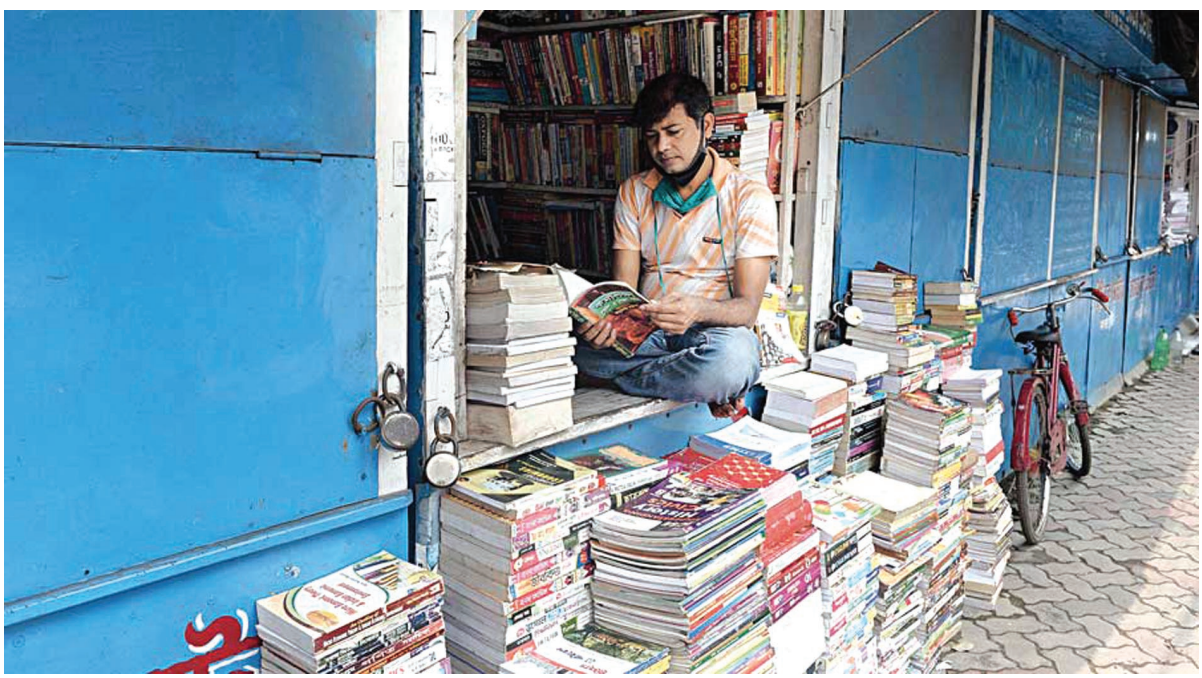

ফঃ ৪

পাশাপাশি ই-বুকের দিকে ঝুঁকছেন। এতে প্রকাশকের ব্যবসা বহাল থাকলেও পুস্তক প্রকাশনার সহযোগী শিল্পগুলো মূলত প্রেস ইত্যাদি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিলই। যার ফল ভুগতে হচ্ছিল কলেজ স্ট্রিট বইপাড়াকেই।

তবে এও সত্যি, নতুন বইয়ের সোঁদা গন্ধের স্মৃতিমেদুরতা বাঙ্গালিকে তার ঐতিহ্য বিমুখ কিন্তু করেনি। তাই ছাপা বইয়ের চাহিদা কমলেও মূলত 'সেকেলে পাঠকে'র জন্য তার বিপরীত প্রবণতাও বেশ লক্ষণীয়ও বটে।

একটা সময় কলেজ স্ট্রিটের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত পাঠ্যবইয়ের বাজার। কিন্তু বর্তমান সরকার নিজস্ব এজেন্সিকে দিয়ে তা ছাপানোয় এবং এর রেফারেন্স বইয়ের বাজার দু-তিনটি প্রকাশনার মধ্যে এখন সংকুচিত হওয়ায় সামগ্রিকভাবে কলেজ স্ট্রিটের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ পাঠকের মানদণ্ডে যুগোপযোগী পাঠ-ব্যবস্থায় যেমন একপক্ষীয় লাভবান, তেমনি কলেজ স্ট্রিটের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের নিরিখে তা কিন্তু কর্মসংস্থান সংকোচনের কারণও হয়েছে। ফলে কলেজ স্ট্রিটের অর্থনীতির হাল যে বিশেষ সুবিধের নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু সুখে-দুঃখে মিলিয়ে একপ্রকার দিন কেটে যাচ্ছিল কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার। আইটি ইন্ডাস্ট্রির মতো হয়তো অত আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা কোনোদিনই বইশিল্পের মধ্যে সুচিত হয়নি। কিন্তু একে কেন্দ্র করে লাখখানেক লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে এবং সমপরিমাণ লোকের পরোক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার কথাও ভুললে চলবে না। কিন্তু এই ব্যবস্থার ওপরই নির্মম আঘাত নেমে এসেছে কোভিড মহামারীকে উপলক্ষ্য করে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজ্য সরকারের নির্মম উদাসীনতা। বই আবশ্যিক সমাজের সর্বস্তরে নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের বই কেনার প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু সেটা পাঠ্যবই। কিন্তু পড়ার বইয়ের বাইরে অন্য বইয়েরও আলাদা চাহিদা আছে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায়। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সেটাই এখনও পর্যন্ত বইপাড়ার অর্থনীতির চালিকাশক্তি। অধ্যাপক, শিক্ষক, পেশাদার গবেষক, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি ভালো চাকুরে ছাড়াও বহু নিতান্ত সাধারণ পাঠক, গ্রন্থ-সংগ্রাহক রয়েছেন, যাঁরা নিয়মিত বই কেনেন। কোভিডে অসংখ্য মানুষ কর্মহারা হয়েছেন। যার প্রভাব সরাসরি এসে পড়েছে বইপাড়ায়।

২০২০ সালের মার্চ মাসের শেষে যখন প্রথম পর্বের সুদীর্ঘতম লকডাউন আরম্ভ হলো, বই ব্যবসার পড়তির শুরু তখন থেকেই। সারাক্ষণ গমগম করা কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার যাবতীয় কোলাহল যেন এক লহমায় থমকে যায়। ওই বছর জুনের পর বিধিনিষেধ মেনে আনলক প্রক্রিয়া শুরু হলেও বইপাড়া আর পূর্বাবস্থায় ফেরেনি। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, ২০ মে-র আমফান ঝড়ের দাপটে জলের তোড়ে বহু প্রকাশকের বহুমূল্য বই ভেসে গিয়েছিল। বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ড করোনা মহামারীর শুরুতে এর মোকাবিলায় দশ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিল রাজ্য সরকারের হাতে। আমফানের পরে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণের কিছু বন্দোবস্ত হলেও গিল্ডের সীমিত সামর্থ্যের তহবিলের পক্ষে সম্ভব হয়নি করোনার অতিরিক্ত আমফানের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার। একে লকডাউন, তায় প্রায় আড়াই মাস যাবতীয় বাণিজ্য থমকে, এর ওপর আবার আমফানের ধাক্কা, জোড়া ফলায় বিদ্ধ হয়ে প্রকাশকরা তবু আশা করেছিলেন পরবর্তীকালে হয়তো পরিস্থিতি সামলে দেওয়া যাবে। কিন্তু সে আশা তাদের পূর্ণ হয়নি। বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য তাঁরা তাকিয়ে থাকতেন মূলত আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলার দিকেই। গত দুবছরের হিসেব বলছে বইমেলা ব্যবসা দিয়েছে অন্তত ২০-২১ কোটি টাকার মতো। আন্তর্জাতিক সুচি মোতাবেকই ২০২১ সালের ২৭ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত ছিল কলকাতা পুস্তক-মেলার দিনক্ষণ। পুজোর পর সংগ্রমণের হার ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকায় বই ব্যবসা ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করছিল।

সামগ্রিকভাবে, বই-ব্যবসায়ীরা ব্যবসা পড়তির কারণে তাঁদের মধ্যে আদৌ কতজন বইমেলায় অংশ নিতে পারবেন, তা নিয়ে অবশ্য সংশয় ছিলই। তবে সব মিলিয়ে এটুকু অন্তত আশা করা গিয়েছিল, বইমেলা হলে সামগ্রিকভাবে বই ব্যবসা কিছুটা হলেও হালে পানি পাবে। গিল্ডও প্রস্তুত ছিল বইমেলা আয়োজনের জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিধি বাম। রাজ্য প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রতার কারণে বইব্যবসা মার খায়। সরাসরি ঘোষণা না হলেও প্রথমে নির্ধারিত সময়ের থেকে একমাস বইমেলা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ বইমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় গিল্ড। টানা চতুর্থবার বইমেলা আয়োজনের কথা ছিল করুণাময়ীর সেন্ট্রাল পার্কে। কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষেও বইমেলা আয়োজনের কথা ছিল করুণাময়ীর সেন্ট্রাল পার্কে। কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষেও বইমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিতে প্রশাসন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেও কোভিড ছড়ানোর ভয় কাজ করছিল। শেষমেশ গিল্ড সিদ্ধান্ত নেয় জুলাইয়ে আয়োজিত হবে ৪৫ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। কিন্তু এর মধ্যেই এসে পড়ে করোনার দ্বিতীয় তরঙ্গ। ফলত আবার লকডাউন।

বইমেলা ছাড়াও বইপাড়া যে আরও একটি অনুষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে থাকে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য, সেটি হলো চিরাচরিত পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে 'নববর্ষের বই উৎসব'। বাংলা বছরের প্রথম দিনটিকে কেন্দ্র করে কলেজ স্ট্রিট চত্বরেই কলেজ স্কোয়ারে নববর্ষের বই উৎসবের মেলা বসত প্রতিবছর। গত বছর লকডাউন থাকায় তা আয়োজন করা সম্ভবপর হয়নি। এবার বইমেলা না হলেও ফেব্রুয়ারি মাসের শেষেও করোনার যা গতিপ্রকৃতি ছিল, তাতেও নববর্ষের বই উৎসবের সমূহ সম্ভাবনা দেখেছিলেন প্রকাশকেরা। কিন্তু মার্চের শেষে করোনা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় ঘুরে দাঁড়ানোর এই সম্ভাবনার আশাটুকুও বিলীয়মান হয়। দ্বিতীয় পর্বের কার্যত লকডাউনে পরিস্থিতি অতি শোচনীয় হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ছোটো প্রকাশন সংস্থার কর্মীদের। তাঁদের পারিশ্রমিক এমনিতেই খুব কম, লকডাউনের বাজারে তাঁদের কপালে সেটুকুও জুটছে না। কি অবর্ণনীয় পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন, তার খবর কেই-বা রাখে! রাজ্য সরকারের উদাসীন দৃষ্টি পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে।

লকডাউনে ই-বুক সংগ্রহের প্রবণতার পাশাপাশি আরও একটা যে প্রবণতা চোখে পড়ছে, তা হচ্ছে পাঠকের অনলাইনে বই কেনা। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের তো বহুজাতিক কোম্পানিগুলির পাশাপাশি এখন বইপাড়ার বেশ কিছু দেশীয় পেশাদার সংস্থাও অনলাইনে বই বিক্রয় করছে। কিছু অভিযোগ থাকলেও মোটের ওপর তাঁদের পরিষেবা পাঠককে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। নেড়েচেড়ে, বই দেখে, বেছে, গন্ধ শুঁকে কেনার যে আনন্দ তাতে পাঠক বঞ্চিত হলেও টিমটিম করে ব্যবসাটা অন্তত টিকে রয়েছে বইপাড়ায়। মোটামুটি অনলাইনে থ্রিলারের বইয়ের ভালোই কাটতি, সুপরিচিত লেখক হলে আধুনিক গল্প, উপন্যাস বা ধ্রুপদী (ক্লাসিক) গল্প, উপন্যাসেরও চাহিদা আছে ভালোই। ঐতিহাসিক উপন্যাসেও লোকে কিনছে। কিন্তু লকডাউনে সাধারণ প্রবন্ধের বই,

বা গবেষণাজাত প্রবন্ধের বইয়ের বাজার পড়তির দিকে। আঞ্চলিক ইতিহাসের বইয়ের বাজারের অবস্থাও তথৈবচ। শেষোক্ত বইগুলি অবশ্যই কোনোদিনই ব্যাপকহারে বিক্রি হয় না। কিন্তু এগুলির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠক-ক্রেতা অবশ্যই আছেন, যাদের দিয়ে ব্যবসাটা অন্তত চলে যায়। এর পাশাপাশি প্রেসিডেন্সি কলেজের পাঁচিলের গায়ে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাগোয়া কলুটোলার দিক বরাবর পুরনো বইয়ের ব্যবসাও চৌপাট হওয়ার জোগাড়। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে কেউ কেউ অবশ্য কোনোমতে ব্যবসাটা টিকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু নিজের চোখে দেখে কেনার সুযোগ পাঠক যদি নাই পান, এই ধরনের বই বিক্রয় হওয়া যে বেশ মুশকিলের তা লকডাউনে প্রমাণিত। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউনে দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত ছাড়ের আওতায় বইপাড়াকে রাখলেও গণ-পরিবহণ বন্ধ রাখায় দোকানদাররা কষ্টেসৃষ্টে এলেও ব্যবসায় লক্ষ্মীলাভ তাঁদের অদৃষ্টে জোটেনি। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় পাঠ্য রেফারেন্স বইয়ের ব্যবসার হালও বিশেষ সুবিধের নয়, খুব দরকার না পড়লে ক্রেতারা ওদিক মাড়াচ্ছেনও না। কলেজ স্ট্রিটের বড়ো রাস্তা, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট প্রভৃতি বইপাড়ার অন্য সময় অতি ব্যস্ত এলাকাগুলি দ্বিতীয় দফার লকডাউনে কার্যত খাঁ খাঁ করছে ক্রেতার অভাবে। যদিও বিক্রেতারা পেটের দায়ে যথারীতি বহুকষ্টে উপস্থিত।

এমতাবস্থায় বইপাড়া তাকিয়ে আসন্ন বইমেলার দিকে। একমাস পিছিয়েও তো হবে, এই আশাতেই পুস্তক বিক্রেতারা বুক বাঁধছেন। তবে একইসঙ্গে তাঁরা রাজ্য সরকারেরও মুখাপেক্ষী। সরকারের যে কোনও আর্থিক অনুদানের প্যাকেজ মুমূর্ষু বইপাড়াকে সঞ্জীবনী সুধা দান করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ রামমোহন লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন ইংরেজি ও হিন্দু বই কেনার জন্য প্রতিবছর বিপুল অর্থ খরচ করে। কলেজ স্ট্রিটের বই ব্যবসায়ীদের একটা বিপুল অংশের তাতে সুরাহা হয়। কিন্তু রামমোহন লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আঞ্চলিক ভাষার অর্থাৎ বাংলা ভাষার বইগুলো কিনে নেওয়ার যে রেওয়াজ আগে ছিল, তা বহুদিন বন্ধ। অবিলম্বে পুনরায় এই ব্যবস্থা চালু হলে আর্থিক সুরাহা কিছুটা হলেও সম্ভব হবে, তেমনটাই মত প্রকাশকদের। কলেজ স্ট্রিটের বড়ো প্রতিষ্ঠান কোভিডের ধাক্কা কিছুটা সামলে নিতে পারলেও মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের দিশেহারা অবস্থা। অথচ এদের ওপরই বইপাড়ার বাণিজ্য অধিকতর নির্ভরশীল।

একদিকে যখন পশ্চিমবঙ্গে এশিয়ার বৃহত্তম বই-বাজারের বেহাল দশা মূলত সরকারি উদাসীনতায়, অন্যদিকে ঢাকার পরিস্থিতি কিন্তু অন্য কথা বলছে। বাংলাবাজার, ঢাকা বিশ্ববদ্যালয়ের সামনে যে পাঠ্যবইয়ের বাজার বসে সেখানকার ব্যবসায়ীরা রীতিমতো পাইকারি হারে বিক্রি করে ও অন্যান্য উপায়ে বই ব্যবসাকে পড়তির দিকে যেতে দেননি। এর ফলে সেদেশে বইবাজার কিছুটা চাঙ্গা থাকার দরুণ প্রবন্ধ সাহিত্যের বইয়েরও কাটতি রয়েছে সেখানে। আর অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থাটা অনেকটা 'ভাত দেওয়ার মুরোদ নেই কিল মারার গোঁসাই'। নিজের দেশের বই বাণিজ্যের হাল খারাপ, অন্যদিকে এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা সাম্প্রদায়িক মুজিবর রহমানের জন্মশতবর্ষের অজুহাতে বাংলাদেশকে থিম কান্ট্রি হিসেবে ডেকে আনা হচ্ছে। উদ্দেশ্য ভারত-বামলাদেশ সম্প্রীতির গল্প শুনিয়ে রাজ্যের শাসক দলের ভোটের কায়েমি স্বার্থ হাসিল করা। কিন্তু ভোটের এই স্বার্থটুকু বাদ দিলে, এর ফলে বাংলা বইয়ের জগতেও বিরাট বড়োসড়ো ধাক্কা আসতে চলেছে। গত কয়েক বছর ধরেই বাংলা বইয়ের বাজার কিন্তু কলেজ স্ট্রিট থেকে ক্রমশ সরে ঢাকা অভিমুখী। সেই প্রবণতাকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই জানতে বা অজান্তে কাজ করা হচ্ছে। এর ফলে মুসলমানি বাংলা মূলধারায় আসবে এবং স্বামীজীর ভাষায় 'প্রাকৃতিক নিয়মে বলবান' হওয়া কলকাতার ভাষা মূল জায়গার দখল হারিয়ে ফেলবে। ■

ছোটো প্রকাশকদের অবস্থা খুবই খারাপ

অজয় মেহতা

বাংলা প্রকাশনার বর্তমান অবস্থা খুব ভালো না হলেও খারাপও বলা যাবে না। বিগত কয়েক বছর ধরে ইংরেজি বইয়ের চাহিদা কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু বাংলা বইয়ের চাহিদা সেই হারে না বাড়লেও, কমছে না এটা ঠিক। বাংলা বইপত্র, পত্রিকার প্রকাশনা ও বিপণনের বর্তমান অবস্থা ইংরেজি ভাষায় তুলনায় কিছুটা হলেও পিছিয়ে। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বই ও পত্রপত্রিকার চাহিদা ও বিপণন ক্ষেত্র অনেক বেশি প্রসারিত। দীর্ঘদিন ধরে করোনা পরিস্থিতি ও লকডাউন, পাশাপাশি প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সুযোগে পাইরেসি ব্যবসা বাংলা প্রকাশনাকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। যদিও এই পাইরেসি ব্যবসায় প্রতিরোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কয়েকটি ক্ষেত্রে বই-সহ সমস্ত সাংস্কৃতিক পণ্যের পাইরেসি এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। প্রকাশন শিল্প এবং পুস্তক ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত সকলেই এক চরম সংকটের মুখে। বিশেষ করে, ছোটো প্রকাশক ও ব্যবসায়ীরা। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড-সহ কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিনিয়ত এদের পাশে থেকে লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছেন।

খুশির খবর, এ বছর কিছুটা দেরিতে হলেও ৪৫তম কলকাতা বইমেলা শুরু হতে চলেছে। বাংলা প্রকাশকরা দ্রুততার সঙ্গে বই প্রকাশের জন্য তৎপর। কিন্তু পরিশেষে যে কথাটা না বললেই নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানে বই উপহার দেওয়ার রীতি নিজেদের পরিবারে চালু করা এবং ছোটো থেকেই বাড়ির শিশুটিকে বাংলা বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়াটাও অত্যন্ত জরুরি। এ ভাবে নিজেদের তাগিদেই বইকে আমরা নিজেদের জীবনের সঙ্গী করে নেব।

(লেখক উর্বী প্রকাশকের কর্ণধার)

বন্দে ভারত ট্রেন : ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উন্নত পরিকাঠামোর ফলে একটি দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে, দেশের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ দেশে নতুন নৌপথ এবং নতুন অঞ্চলে সামুদ্রিক বন্দরগুলিকে বিমান পথে সংযুক্ত করার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছে। সময় বাঁচানোর পাশাপাশি সহজ পরিবহণ ব্যবস্থা কাজের সুযোগও তৈরি করছে। এই সমস্ত বিষয় বিচার করে ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাচীর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে রেলের উন্নয়নের গতিকে আরও বৃদ্ধি করতে ৭৫টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করা হবে, যা দেশের প্রতিটি কোণকে সংযুক্ত করবে।

২০১৪ সালের পরে ভারতীয় রেলওয়ের গতি, ক্ষমতা এবং নেটওয়ার্ককে মজবুত করার লক্ষ্যে বহু সংস্কার সাধন করা হয়েছে, একাধিক কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষ্যে ২০২৩ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে ৭৫টি বন্দে ভারত ট্রেন চালানো হবে। দুটি বিদ্যমান বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গেই এই ট্রেনগুলি চলবে। প্রথম ট্রেনটি বারাণসী-দিল্লি রুটের জন্য এবং দ্বিতীয়টি কাটরা-দিল্লি রুটের জন্য চালু করা হয়েছিল। এখন ভারতীয় রেল হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালানোর পরিকল্পনা করছে এবং রেলওয়ে বোর্ড এই রুটের অনুমোদন দিয়েছে। এটি হবে তৃতীয় বন্দে ভারত ট্রেন যা হাওড়ার (কলকাতা) সঙ্গে ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচিকে যুক্ত করবে।

বন্দে ভারত ট্রেন প্রথম দেশীয় সেমি ফাই হাই-স্পিড ট্রেন। সম্প্রতি ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ভারতীয় রেলওয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মডেল প্রদর্শন করেছে, যা তার প্রগতিশীল যাত্রাকে তুলে ধরেছে। এটি ভারতের সবচেয়ে আধুনিক ট্রেন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ইউরোপীয় কায়দায় ট্রেনগুলি তৈরি হয়েছে। রেল মন্ত্রকের ট্রেনের অফিস প্রাঙ্গণেও এই ট্রেনের একটি রেপ্লিকাও রাখা হয়েছে।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর ব্রেকিং সিস্টেম। কারণ এটি দ্রুত এবং কম গতির উভয়ের জন্যই অনুমতি দেয়। এই ট্রেনে অত্যাধুনিক বিনোদনের পাশাপাশি ওয়াইফাইয়ের সুবিধাও পাওয়া যাবে। এগুলি চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি, রায়বেরেলির মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরি, রায়বরেলির মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরি এবং কাপুরথালার রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হবে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে স্বয়ংক্রিয় প্রবেশ, একটি মিনি প্যান্ট্রি, মডুলার বায়ো-ভ্যাকুয়াম শৌচাগার, সম্পূর্ণ সিল করা গ্যাংওয়ে এবং ধুলোমুক্ত পরিবেশের জন্য সেন্সরযুক্ত আন্তঃসংযোগ দরজার ব্যবস্থা থাকবে। ট্রেনে 'ফায়ার সার্ভাইভাল ক্যাবল ইনডোর' সার্কিট ও উন্নত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও থাকবে। প্রতিটি কোচে চারটি 'ডিজাস্টার লাইট' থাকবে। এছাড়াও জরুরি পুরবাটনের সংখ্যাও বাড়ানো হবে।

হাওড়ার লিলুয়ায় লাভ জিহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লাভ জিহাদ কথাটায় অনেকের আপত্তি আছে। তারা বলেন, ভারতের কোথাও লাভ জিহাদ বলে কিছু হয় না। এসব বিজেপির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। লাভ জিহাদ হয় কি হয় না সেটা বোঝার জন্য হাওড়ার লিলুয়ার ঈশা দেব রায়ের ঘটনাটি সম্ভবত যথেষ্ট হবে। ইশার বয়েস আঠারো বছর। তিনি লিলুয়ার ভট্টনগরে থাকেন। আফতাব শেখ নামে এক যুবক হিন্দু পরিচয় দিয়ে ঈশার সঙ্গে আলাপ জমায়। বাবা-মা'র অগোচরে ধীরে ধীরে দু'জনের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি ঈশা অফতাবের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। ঈশার মা ঋতু দেব রায় তাঁর অভিযোগপত্রে আফতাব সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিয়েছেন। আফতাব মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়া জেলার কোতওয়ালি এলাকার ছেলে। আফতাব নিজের পরিচয় গোপন করে নিজেকে হিন্দু হিসেবে পরিচয় দেয়। দেব রায় পরিবারের সবাই তাকে বিশ্বাস করেছিল। সেই সুযোগ নিয়ে আফতাব ঈশাকে অপহরণ করে। ঋতুদেবী জানিয়েছেন ২৩ জানুয়ারি থেকে ঈশার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ফোন ছিল সুইচড অফ। মেয়েকে ফিরে পাওয়ার কোনও রাস্তা বের করতে না পেরে ঋতুদেবী বিজেপির জনজাতি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সুদীপবাবু উদ্যোগ নিয়ে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনা করেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গেও। ২৪ জানুয়ারি রাতে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে ফোন করে জানানো হয় ঈশাকে উদ্ধার করা হয়েছে। সুতরাং লাভ জিহাদ হয় না বলাটা ভুল। ঋতুদেবীও তাঁর অভিযোগ লাভ জিহাদের কথাই লিখেছেন।

আফতাব শেখ

মাঘমণ্ডলের ব্রত

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

'মাঘমণ্ডল' পূর্ববঙ্গের এক কুমারী ঐতিহ্য। মাঘ মাসে পালিত হয় এই ব্রত। পাঁচ বছরের জন্য কুমারী মেয়েদের সূর্য-উপাসনা। ব্রতের দুটি মূল কাজ— পঞ্চগুঁড়ির রঙিন আলপনা আঁকা আর 'বারৈল' বা 'লাউল' নামে মাটির প্রতীক নির্মাণ। এরপর ফুল-দুর্বা দিয়ে প্রতীকটিকে সাজানো হয়; তারপর পুজো করা হয়।

মাঘমণ্ডল ব্রতে উঠোনে আঁকা হয় ব্রতমণ্ডল; উপরে গোলাকার সূর্য, আর নীচে অর্ধচন্দ্র বা চন্দ্রকলা; মাঝে অয়ন-মণ্ডল। অয়ন-চিহ্নের সংখ্যা দিয়ে বোঝা যায়, কত বছর ধরে কুমারীর ব্রত চলছে। 'আমার মার বাপের বাড়ি' গ্রন্থে রানি চন্দ লিখেছেন, 'এক বছরে এক গোলের আলপনা, দু' বছরে দু গোলের। এক গোলের গায়ে আর একটি বৃত্ত দাগা... তিন বছরে তিনটি বৃত্ত, চার বছরে চারটি এবং পাঁচ বছরে পরপর রেখা টানা পাঁচটি বৃত্তের প্রকাণ্ড একটা আলপনা'।

এই ব্রতে পিটুলি গোলার আলপনা দেওয়া হয় না, দিতে হয় চালের গুঁড়ির সঙ্গে হলুদ, সিঁদুর, ধানের পোড়ানো তুষ, শুকনো বেলপাতার গুঁড়ো মিশিয়ে। সব রঙিন আলপনা। রোজই দেওয়া হয় এই আলপনা। দু' আঙুলের টিপে গুঁড়ি নিয়ে আঙুল নাড়িয়ে ঝুরঝুর করে ফেলে আঁকা হয় লতাপথ। পৌষের সংক্রান্তির পরদিন থেকে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে এই ব্রত।

'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান' গ্রন্থে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখছেন, 'প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দুর্বাগুচ্ছের সাহায্যে চোখে ও মুখে জল ছিটাইতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'চউখে মুখে পানি দেওয়া'। সূর্য উঠিলে পাঁচালি গান করিয়া 'বারৈল' ভাসান হয়। ...বারৈল দুইটিকে ফুল দুর্বা দিয়া সাজাইয়া একখানি ছোটো তক্তার উপর বসাইয়া পুষ্করিণীর জলে ভাসাইতে হয়। ইহার পর মণ্ডলের উপর ফুল দিতে হয়। পাঁচালিতে সূর্যের পূর্বরাগ ও বিবাহের কাহিনি বর্ণিত হইয়াছে।'

গ্রামের কিশোরীরা কাকভোরে কাঁথা জড়িয়ে ঘন কুয়াশা ঠেলে তাদের মা, দিদা-ঠাকুমার সঙ্গে গাঁয়ের ঝোপ ছাড়িয়ে, শিশিরে ভেজা ঘাস মাড়িয়ে চলে যা ঘাটলায়। কে আগে ঘাটে যাবে যেন তার প্রতিযোগিতা। জলের কাছে ঘাটে রাখা হয় 'বারৈল' বা 'লাউল'। তার সর্বাঙ্গ অতসী, টগর, কলকে, গাঁদা বা বুনো ফুলে ঢাকা। লাউলের গা দেখা গেলেই দোষ। আগের রাতে সাজিয়ে রাখা হয় লাউল।

কিশোরীরা একসঙ্গে সুর করে গায় ব্রতের ছড়া; সূর্যকে স্বাগত জানানোর মন্ত্র, 'উঠো উঠো সূর্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া,/না উঠিতে পারি মোরা শিশিরের লেইগা।' সূর্য উঠবেন, তাই তার পথ প্রশস্ত করতে কিশোরীরা সাজির ফুল জলে ছুঁড়ে সুর করে গায়, 'খুয়া ভাঙ্গি থুয়া ভাঙ্গি এ্যাচলার আগে,/সকল খুয়া গেল বড়োই গাছটির আগে।' ধীরে ধীরে বড়োই বা কুল গাছের মাথা পরিষ্কৃত হয়ে কুয়াশা দূরীভূত হয়, সূর্য ওঠে, তার আলোকিত করুণায় পৃথিবী সচল হয়। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' গ্রন্থে স্বামী নির্মলানন্দ লিখছেন, 'তিনি উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতি, সুড়ি, তিলি, মালী

সকলকে জাগিয়ে তোলেন, সকলের গৃহই তিনি আলোকিত করেন, তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্যে ব্রতী হয়— সমগ্র জগৎ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে। ব্রাহ্মণ বধূ উপবীত, তন্তুবায় বধূ বস্ত্র, কর্মকার বধূ মাল্যাদি সরবরাহে ব্যস্ত হয়। ব্রতের ছড়ার ভিতরে এ দৃশ্যের এক চমৎকার বর্ণনা পরিস্ফুট। সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের একটা পরিষ্কার ছবি কুমারীদের অন্তরে স্বতঃ জাগ্রত হয়। ব্রতের ছড়ার মধ্যে এ রকম অনেক শিক্ষাই আছে।'

এই ব্রতের সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয়টি দেখানো হয়েছে চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিবাহানুষ্ঠানের প্রসঙ্গে। মাধবের কন্যা অপরূপ লাবণ্যবতী তন্বী-বালা চন্দ্রকলা। তাকে দেখে, তার রূপে সূর্য পাগল হয়ে বিয়ে করতে চান। ছড়ায় দেখতে পাই,

'চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া
ছিলেন কেশ।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর ফিরেন নানা
দেশ।।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া
দিছেন শাড়ি।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর ফিরেন বাড়ি
বাড়ি।।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া
পায়।
তারে দেইখ্যা সূর্য ঠাকুর বিয়া করতে
চায়।।'

সূর্যের মতো এক পাত্র পেলে মাধবের আপত্তি থাকার কথা নয়, তাই সুসম্পন্ন হয়ে গেল তাদের শুভবিবাহ। সূর্য পেলেন অজস্র দান সামগ্রী। কী নেই তাতে; আর হবেই-বা না কেন? মাধব যে লক্ষ্মীপতি! অতএব বিয়ের পর চন্দ্রকলা চললেন পতিগৃহে; আর এখানেই দেখানো হয়েছে বিচ্ছেদ আর মিলনের বেদনা-সুখের আনন্দঘন মুহূর্ত, পল্লী বাঙ্গলার চিরায়ত আবেগসঞ্চার। ব্রতিনীদের জীবনেও আসবে এই দিন। মা-বাবা-ভাই-বোন, প্রিয়জন, ক্রীড়াসহচরীদের ছেড়ে যেতে হবে স্বামীগৃহে। আবার মিলনসুখ অপেক্ষা করছে সেখানে, মিলনানন্দের আবেগ, লোকলাজ— সব মিলিয়ে এ এক দুঃখ-সুখের যুগলবন্দি!

মাঘমণ্ডল ব্রতের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিন-অঙ্কে বিভক্ত ব্রতের ছড়ার অসাধারণ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। 'বাঙ্গলার ব্রত' গ্রন্থে তিনি লিখছেন, 'এই মাঘমণ্ডল-ব্রতের প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে যে সূর্য যা তাঁকে সেই-রূপেই মানুষে দেখছে এবং বিশ্বাস করছে যে, জলের ছিটায় কুয়াসা ভেঙে দিলে সূর্য-উদয়ের সাহায্য করা হবে। এখানে কামনা হলো সূর্যের অভ্যুদয়। ক্রিয়াটিও হলো কুয়াসা ভেঙে দেওয়া ও সূর্যকে আহ্বান। দ্বিতীয় অংশে চন্দ্রকলাকে দীর্ঘকেশ গোল-খাড়ুয়া-পায়ে একটি মেয়ে এবং সূর্যকে রাজা বর এবং সেই সঙ্গে সূর্যের মা ও চন্দ্রকলার বাপ কল্পনা করে মানুষের নিজের মনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ির যে-সব ছবি আছে, সূর্যের রূপকের ছলে সেইগুলোকে মূর্তি দিয়ে দেখেছে। তৃতীয় অংশে সূর্য-পুত্র বা রায়ের পুত্র রাউল বা লাউল, এক-কথায় বসন্তদেব; টোপরের আকারে এঁর একটি মূর্তি মানুষে গড়েছে এবং সেটিকে ফুলে সাজিয়ে মাটির পুতুল হালামালার সঙ্গে বিয়ের খেলা খেলেছে। এখানে কল্পনার রাজ্য থেকে একেবারে বাস্তবের রাজ্যে বসন্তকে টেনে এনে, মাটির সঙ্গে এবং ঘরের নিত্যকাজের এবং খুঁটিনাটির মধ্যে ধরে রাখা হলো'।

লাউল বা লালুর বিয়ে করতে যাবার ছড়াটি খুব মনোরম।

'জলের মধ্যে ছিপছিপানী কিসের বাদ্য বাজে,

চান্দের বেটা লাউল্যা সোনার নূপুর দিয়া,

ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুইল্যা দিমু বিয়া।' লাউল বউ নিয়ে আসে; বিয়ের ভোজে সূর্য গামছা মাথায় দিয়ে অন্দরমহলে তদারকি করেছেন। 'ঝিকুটি' খেলতে গিয়ে পাওয়া গিয়েছে কিছু টাকা, তা দিয়ে লাউলের বউকে শাঁখা পরান—

'লাউল্যার বউরে শাঁখা দিয়া বেশি
হইল টাকা/
সেই টাকা দিয়া দিলাম মায়েরে শাঁখা।'

মাটির সঙ্গে সূর্যের ছেলে বসন্তদেব বা লাউলের বিয়ে আর মিলনের পালাও শেষ। ঋতুরাজ পৃথিবীকে ফুলে-ফলে ভরিয়ে বিদায় নিচ্ছেন। তাকে যেতেই হবে, একলাই, আবার শীতের মধ্যে বসন্ত হয়ে ফিরবেন, এখন বিদায়। কিন্তু মেয়েরা বৃথাই তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে—

'কৈ যাওরে লাউল গামছা মুড়ি দিয়া?
তোমার ঘরে ছেইলা হইছে বাজনা
জানাও গিয়া।

ধোপা জানাও গিয়া, নাপিত জানাও গিয়া, পুরুইত জানাও গিয়া।' লাউলের ছেলে নাম রাখার অনুষ্ঠান— 'লাউলের ঘরে ছেইলা হইছে কি কি নাম-থুমু?/আম দিয়া হাতে রাম নাম থুমু।/বরই দিয়া হাতে বলাই নাম থুমু।/কমলা দিয়া কমল নাম থুমু।/জল দিয়া জয় নাম থুমু।/রাজার বেটা রাজার ছেইলা রাজা নাম থুমু।' কিন্তু লাউলকে সাজ-সরঞ্জাম লণ্ডভণ্ড করে ভেঙ্গে পড়ল ফুলে-ভরা জইতের ডাল। ঋতুরাজকে বিদায় দিতেই হলো—

'আজ যাও লাউল,/কাল আইসো।/নিত নিত্য দেখা দিও।/বছর বছর দেখা দিও।'

অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে দেখা যায় মৎস্যজীবী মালো মেয়েরা নিষ্ঠা ভরে মাঘমণ্ডলের ব্রত করছে। মাঘমাসের প্রতিদিন সকালে কুমারী মেয়েরা স্নান করে ভাঁটফুল ও দুর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জলে সিঁড়ি পুজো করে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র আওড়ায়। বিবাহের কামনাতেই এই ব্রত। ব্রতের শেষদিন তৈরি হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি, সেই চৌয়ারি মাথায় করে ভাসানো হয় তিতাসের জলে। অক্ষত চৌয়ারির দখল নিতে কিশোরেরা হুল্লোড় করে ওঠে। উঠোন জোড়া আলপনার মাঝে কিশোরী ছাতা মেলে বসে, তার মা ছাতার উপর ছড়িয়ে দেয় খই-নাড়ু, আর তা কাড়াকাড়ি করে খায় কিশোরেরা। □

মহাদেবের চোখের জলে কাটাসরাজ

সন্তোষ সরকার

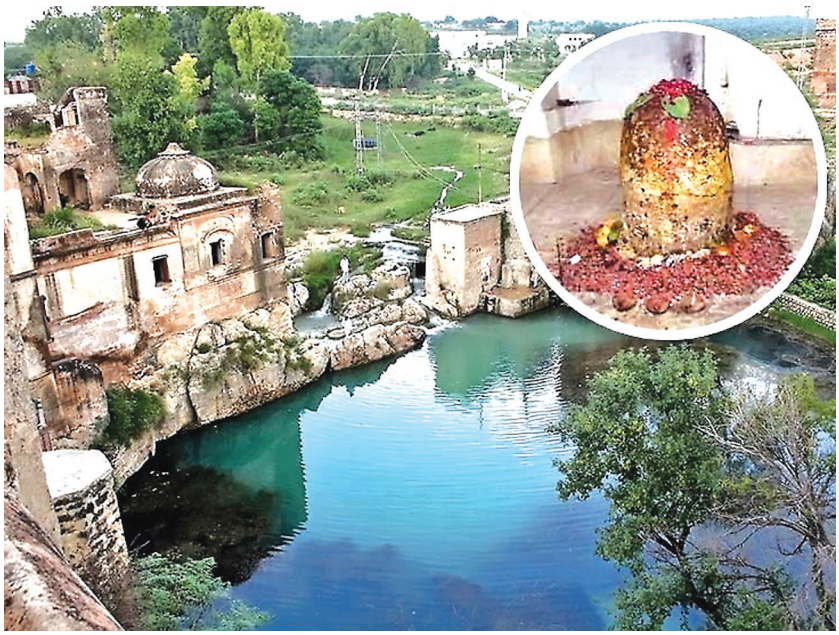

শুরুটা একটু আগে থেকে করছি। বাড়িতে একা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই ভাবলাম কোথাও ঘুরে আসা যাক। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হলো আমরা বৈষ্ণোদেবী যাত্রায় যাব। কিন্তু আমি যেহেতু এর আগে কাশ্মীর যাইনি সেজন্য আমি কাশ্মীর যাওয়ার কথা বললাম। ওখান থেকে ফেরার আগেই আমাদের এখানকার একজন কৈলাসী জানতে চাইলেন আমি কাটাস রাজ যেতে আগ্রহী কিনা? কারণ ওটা পাকিস্তানে। আমি রাজি হয়ে গেলাম। আমরা ১৩ তারিখে অমৃতসর মেলে রিজার্ভেশন করলাম। যাত্রার আগে ভিসার খবর না পাওয়াতে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম ভিসা আমাদের হবে না। কিন্তু ১৫ তারিখ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে পৌঁছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল ভিসা পাওয়া গিয়েছে। যাত্রা ১৭ তারিখ। যাত্রার আগে দলনেতা নির্বাচন হলো এবং যে যার মতো করে আমরা ওয়াঘা বর্ডারে পৌঁছলাম। ওখান থেকে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের নিয়ম পালন করে আমরা পদব্রজে পাকিস্তান এলাকায় ঢুকলাম। দেখলাম ওখানকার মন্দির কমিটি ফুল ছিটিয়ে এবং ফুলের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

পাকিস্তানের ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস চেকিঙের পর দেখলাম বাইরে সামিয়ানা খাটিয়ে আমাদের জন্য দুপুরের ভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। সবাই আসতে সময় লাগলো, কারণ আমরা সংখ্যায় ছিলাম ৮৭ জন। দুপুরের ভোজন শেষ করে দুটো লাক্সারি বাসে লাহোরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। তারপর আমাদের লাহোরস্থ গুরুদোয়ারাতে নিয়ে যাওয়া হলো রাত্রিবাসের জন্য। লাহোরের তাপমাত্রা আমাদের দিল্লির তাপমাত্রার মতোই। পরের দিন আমরা টিফিন করে আবার দুটো বাসে কাটাস রাজের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম যেটা লাহোর থেকে ২৭০ কিলোমিটার। পথে আমাদের এক ফুড প্লাজারের কাছে বাস দাঁড়ালো। দেখলাম খাবার অত্যধিক দুর্মূল্য, যদিও ওদের টাকার মূল্য আমাদের থেকে অর্ধেক। এক কাপ চা ৭০ টাকা, কফি ১৯০ টাকা। শহর থেকে রওনা দেওয়ার আগে প্রত্যেকের কাছ থেকে চার হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছিল বর্ডার থেকে বর্ডার অবধি খরচ মেটানোর জন্য। আমি কিছু না খেয়েই বাসে উঠে বসলাম। সন্ধ্যার একটু আগে মন্দির কমিটির উদ্যোগে আমরা কাটাসরাজ মন্দিরের কাছে একটা মাইনিং কলেজে আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

পরের দিন অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর আমরা সবাই কাটাস রাজ দর্শনের জন্য পুলিশের সুরক্ষা বলয় নিয়ে সেখানে পৌছালাম। কাটাস অর্থ চোখের জল। দক্ষের যজ্ঞে সতীমা আত্মাহুতি দেওয়ার পর শিব খুব কষ্ট পেয়ে কেঁদেছিলেন। পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী শিবের চোখ থেকে যে দু'ফোঁটা জল বেরিয়েছিল তারই এক ফোঁটা এই কাটাসে পড়েছিল আর অন্যটা পড়েছিল রাজস্থানের আজমিরে যেটা পুষ্কর রাজ হিসেবে খ্যাত। আমাদের মহাভারতেও এই স্থানের উল্লেখ আছে। কথিত আছে, পাণ্ডবেরা বনবাসের অনেকটা সময় এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। এখানে আরও বেশ কয়েকটা মন্দির থাকায় এটাকে মন্দির কমপ্লেক্সও বলে। শিবলিঙ্গ ছাড়া আর কোনো মন্দিরে কোনো বিগ্রহের দর্শন পাওয়া গেল না। অনুমান করা যায় এই সমস্ত বিগ্রহ ধ্বংস করা হয়েছে।

মহাদেবের সেই চোখের জলেই তৈরি হয়েছে এক জলাধার। তীর্থযাত্রীরা নিয়ম করে অন্তত একবার ওই জলে ডুব দিয়ে থাকেন। ওই ঠাণ্ডার মধ্যে প্রত্যেকেই আমরা একে একে ওই ঠাণ্ডা জলে ডুব দিলাম। তারপর শিবলিঙ্গ দর্শন করে আমরা আবার বেরিয়ে পড়ে মন্দির সংলগ্ন আরও যেসব বিগ্রহ মন্দির আছে সেগুলো দর্শন করলাম। কয়েক একর জায়গা নিয়ে এই কাটাস রাজ মন্দির। আমাদের সফর শেষ হলো। তৃতীয় দিন আমাদের ফেরার পালা কিন্তু আমরা আরেকবার মন্দির যেতে চাইলে সুরক্ষা বাহিনী আমাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখার পর অনুমতি দিল। আমরা আবার সেই জলাশয়ে স্নান সম্পন্ন করে অল্প কিছু খেয়ে সুরক্ষা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাসে উঠলাম। সেই একই পথে লাহুল গুরুদোয়ারাতে ফিরে এলাম।

ওখানে যেভাবে আমাদের সুরক্ষা বলয় দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল সেটা দেখার মতো। এর থেকে বোঝা যায় আমরা সে দেশে কতটা নিরাপত্তাহীন। সাধারণ পুলিশ কর্মচারী নয়, এমনকী পুলিশের বড়ো কর্তারাও এসে আমাদের দেখে যেতেন সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। শেষের আগের দিন আমরা অনেকেই সুরক্ষা ছাড়াই বেরিয়ে পড়লাম সন্ধ্যের দিকে। আমরা ওখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম সাধারণভাবে পাকিস্তানিরা ভারতীয়দের শ্রদ্ধা ভক্তি করে। কারণটা হয়তো খুবই স্বাভাবিক, যেহেতু সব দিক দিয়ে ভারত পাকিস্তানের কয়েক যোজন আগে। আমরা প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ গুরুদোয়ারায় ফিরে এসেছিলাম। পরেরদিন আমরা আবার মাতৃভূমির উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রশাসনিক নিয়ম মেনে বেলা দুটো নাগাদ এসে পৌঁছলাম। □

দাক্ষিণী প্রতিভার ত্রিবেণী সঙ্গম

কৌশিক রায়

দাক্ষিণাত্যের রাজা রবি বর্মার পৌরাণিক চিত্রশৈলী, মোহিনীঅট্টম, কুচিপুড়ি, কথাকলি নৃত্যের ছান্দসিকতা আজ দেশে বিদেশে সাদরে গৃহীত। তবে, ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যে দাক্ষিণাত্যের কথা অসমাপ্ত রয়ে যাবে তিন কৃতী মনীষার কথা না বললে। ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী চরমপন্থী আন্দোলনের ত্রয়ী— লাল-পাল-বালের মতোই দক্ষিণ ভারতের এই

সুব্রহ্মণ্যম্ আইয়ার, চিদাম্বরম পিল্লাই, সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী।

তিন প্রতিভা— চিদাম্বরম পিল্লাই, সুব্রহ্মণ্য আইয়ার ও সুব্রহ্মণ্য শিবার খ্যাতি আজ জগৎজোড়া। ভারতমাতার জন্য সবকিছুই স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছিলেন এই তিন দক্ষিণী নক্ষত্র।

স্বদেশি আন্দোলনের বিস্তার হওয়ার পর এদেশে জলপথ পরিবহণের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিলেন শিল্পোদ্যোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক চিদাম্বরম পিল্লাই। 'ভিও' নামে সুপরিচিত চিদাম্বরমের আসল নাম ভাল্লিনাইয়াগান উলগানাথন চিদাম্বরম। এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে তামিল ভাষায় শ্রদ্ধাভরে ডাকা হতো 'কাপ্পালোত্তিইয়া তামিঝান' বা 'ভারতের সেরা নাবিক' নামে। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব প্রসারে রবার্ট ফুলটনের উদ্ভাবিত বাষ্পশক্তিচালিত নৌকো বা স্টিমবোট যে একটি শক্তিশালী পণ্য ও গণপরিবহণে পরিণত হয়েছিল সেটা লক্ষ্য করেছিলেন চিদাম্বরম। তাই ভারতের জলপরিবহণ এবং সমুদ্রবাণিজ্যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্যকে খর্ব করতে ১৯০৬ সালে চিদাম্বরম পিল্লাই গড়ে তুললেন 'স্বদেশি স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি'। তাঁরই উদ্যোগে ভারতে সর্বপ্রথম জাহাজ পরিষেবা চালু হলো তামিলনাড়ুর দক্ষিণতম বন্দর তুতিকোরিন থেকে শ্রীলঙ্কার কলম্বো পর্যন্ত।

মাত্র ৩৯ বছরের আয়ু ছিল দেশপ্রেমিক কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর। তবুও এই স্বল্পায়ু জীবনেই সুব্রহ্মণ্য ভারতী ধূমকেতু সম উজ্জ্বলতার কবিতা, প্রবন্ধ এবং জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতা ভারতবাসীর শ্বেতাঙ্গ-শোষণের বিরুদ্ধে মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধান দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য শেষ জীবনে সস্ত্রীক পুদিচ্চেরীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যের 'নজরুল'— সুব্রহ্মণ্য ভারতী। তাঁর 'বাতাস' কবিতাটিতে বায়ুপ্রবাহকে পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকবাদ এবং স্বৈরাচারকে বিধ্বস্ত করে ভারতে স্বাধীনতার নবযুগ নিয়ে আসার বার্তাবাহক রূপে প্রতিভাত করা হয়েছিল।

শিশু কিশোরদের জন্য লেখা একটি তামিল গান--- 'পাআপ্পা পাত্তু'তেও দেশভক্তিকে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন মহাকবি ভারতী। দেশভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরে আমৃত্যু বিশ্বাস রেখে ছত্রপতি শিবাজী, গুরু গোবিন্দ সিংহ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো মনীষীরা যে ভারতে নবজাগৃতি নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, সেটা তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর রচনাতে। ভগিনী নিবেদিতার স্নেহসান্নিধ্যে এসে সুব্রহ্মণ্য ভারতী ভারতীয় সংস্কৃতিতে এদেশের কন্যা-জায়া-জননীদের অবদানের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। সংসার ধারণকারিণী উমা এবং অসুরদলনী দেবী দুর্গা ও চামুণ্ডা— এই দুই রূপই যে ভারতীয় নারীত্বের মধ্যে বিকশিত হয়েছে, সেটাই পল্লবিত হয়েছে সুব্রহ্মণ্য ভারতীর রচনার মধ্যে। পূর্বপুরুষদের আদর্শের প্রতি ভক্তিকে তিনি যুবসমাজের কাছে স্বদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম কষ্টিপাথর বলে মনে করতেন। কর্ম সংস্থানমূলক জাতীয় শিক্ষানীতি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষিজ পণ্য বিপণন, গ্রামের স্বনির্ভরতা ও স্বায়ত্তশাসন, সড়ক উন্নয়ন, পরিবহণ ব্যবস্থার মতো যে সাধু উদ্যোগগুলি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে চলেছেন, সেগুলিরও খসড়া করে গিয়েছেন সুব্রহ্মণ্য ভারতী।

দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধিক বলয়ে সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে যদি গঙ্গা এবং চিদাম্বরম পিল্লাইকে যদি যমুনার সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে সরস্বতী নদীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে মাত্র ৪১ বছরের আয়ু নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশাত্মবোধক সাহিত্য ও সাংবাদিক তাতে আলোড়ন তোলা মনীষী—সুব্রহ্মণ্য শিবার। মাদ্রাজ জেলখানাতে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে ছিলেন সুব্রহ্মণ্য। কারাগারেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। নির্মম শ্বেতাঙ্গ শাসক তাঁকে রেলযাত্রার অনুমতি দেয়নি। তাই অসুস্থ শরীর নিয়েই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে তিনি অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ ও দেশাত্মবোধক সাংবাদিকতাকে ঐতিহাসিকরা লেনিনের 'ইজভেস্তিয়া' ও 'প্রাভদা', ম্যাৎসিনির 'আভান্তি', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দ্য হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমাদের কাছে সুব্রহ্মণ্য শিবা, সুব্রহ্মণ্য ভারতী এবং চিদাম্বরম পিল্লাই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন 'ত্রিশক্তি' রূপে ভারতের নবজাগরণের জন্য। চিদাম্বরম পিল্লাইকে মনে রাখা হয় 'ইচ্ছাশক্তি' রূপে, সুব্রহ্মণ্য শিবা-কে মনে রাখা হয় 'ক্রিয়াশক্তি' রূপে এবং সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে আমরা চিরকালই মনে রাখবো 'জ্ঞানশক্তি' বা 'সরস্বতীর বরপুত্র' রূপে। □

আধ্যাত্মিকতার আলোকে বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দর্শন তত্ত্ব

দীপক খাঁ

একটা প্রশ্ন দিয়েই শুরু করা যাক, এই মহাবিশ্বের বয়স কত? সৃষ্টিতত্ত্ববিদরা একমত যে, প্রায় ১৪ বিলিয়ান অর্থাৎ ১৪০০ কোটি বছর। তবে একটা কথা সত্য আমাদের মুনি-ঋষিরা মানেন এই মহাবিশ্ব আরও প্রাচীন।

Planck-এর ডাইমেনশনে যদি বিজ্ঞান প্রকৃতিকে দিতে পারে মাপন ইউনিট বা একক, তা হলে ধর্ম কি পারে না ঈশ্বরকে দিতে সৃষ্টির জন্য একটা টাইম ইউনিট? সেই ইউনিট সাত দিনও হতে পারে, আবার হতে পারে 'অনন্তকাল'ও। সময়ের জন্মের আগে কি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানের কোনো প্রতিষ্ঠিত ধারণা তো নেই।

ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে তেমন ফারাক কিছু নেই। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বের জন্মক্ষণে দেখা দিয়েছিল একটি মাত্র ক্ষেত্র বা ফিল্ড, যার মধ্যে ধৃত ছিল সমগ্র মহাবিশ্বের 'ব্লুপ্রিন্ট' যেমন একটি মানব কোষের মধ্যে ধৃত থাকে একটি পূর্ণ মানুষের 'প্ল্যান'। যদিও এটিকে 'ফিল্ড' বলছি, যথাযথ ভাবে বললে, বলা উচিত 'ইউনিফিকেশন'। কারণ এর মধ্যে আলাদা-আলাদা শক্তি বা কণাকে শনাক্ত করা যায় না।

আমরা ভাবি 'ইউনিফিকেশন'-টা শেষে হয়ে, প্রথমে নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে 'ইউনিফিকেশন'টা প্রথমে যার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। এই রকম মনে জাগরুক হয়ে উঠা কি খুবই দুঃসাহসিক হয় যাবে যে, এই আদি সিঙ্গল ফিল্ড, যাকে এখনও ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়নি— এই ফিল্ডকে অন করে দিল মহাবিশ্বের শুরুর 'সুইচ' আর অমনি এই ক্ষেত্রেই ভাসিয়ে দিল মহাশূন্য জুড়ে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র।

কল্পনাকে একটু প্রসারিত করলে দেখতে পাবো, মহাবিশ্বের এই বীজটি— 'যা সামান্য কিছু একটা আর যার চারপাশে কিছুই নেই।' বীজটি অঙ্কুরিত হচ্ছে— যার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে মহাবিশ্বের নিহিত সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'মহাবিশ্বের নিত্যকালের উৎসব— বিশ্বের দীপাবলি।' যেন এই বীজটির প্রাণের কেন্দ্রে ভরা ছিল মহাবিশ্বের নিশ্বাস, মহাবিশ্ব সৃষ্টির ইচ্ছা লুকিয়ে ছিল এই বীজের মধ্যেই। আলোক দীপ্ত সেই ইচ্ছাটুকুকে কি ভাবা যায় না আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ রূপে? যে স্ফুলিঙ্গ চাইছে আগুন হয়ে উঠতে? ল্যাটিন অর্থে 'ইনসপিরেশন', যার মানে 'নিশ্বাস পুরে দেওয়া', যেভাবে আদমের মধ্যে প্রাণের নিশ্বাস পুরে দিয়েছিলেন 'গড'। এই ল্যাটিন 'ইনসপিরেশন'-ই সংস্কৃত ভাষায় 'প্রাণন'।

মহাসৃষ্টির প্রারম্ভে প্রয়োজন ক্ষণিকের 'ইনস্টেবিলিটি' যেন মহাজাগতিক একটি হাঁড়ি, শুধু এইটুকু ইনস্টেবিলিটি। বিজ্ঞানীরা এই কথাই বলেছেন। কিন্তু তাঁরা এই সহজ কথা বলতে এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয়। যেমন, 'কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন',

'স্কেলার ফিল্ড অব্ সিমেট্রি ব্রেকিং' অথবা 'ফলস্ ভ্যাকুয়াম'। এই সকল শব্দের আড়ালে সহজ সত্যিটি লুকিয়ে আছে, কিছু একটা ভেঙে দিল মহাজাগতিক ডিমটিকে এই ঘটনার আগে অন্য এক ঘটনা বিশুদ্ধ সম্ভাবনার 'প্রি-স্পেস'কে বিপর্যস্ত বা 'আপসেট' করে। এমন একটি অবস্থাকে— যাতে হুইলারের প্রশ্নে পৌঁছতে দেরি হবে না। আমাদের চেতনা কি তৈরি করল মহাবিশ্বকে? যদি চেতনা না করে থাকে, তাহলে কী বা কে করল? যাই হোক এই 'সিঙ্গল ফিল্ড' থেকে ক্রমে তৈরি হলো অন্য সব ক্ষেত্র এবং তাদের প্রকাশের বিচিত্র রূপ— ওই সিঙ্গল ফিল্ড'। যেমন আগেই বলা হয়েছে 'হিউম্যান জিনোম'— এই নিয়ে একক কোষ থেকে তৈরি হয় একটি সম্পূর্ণ মানুষ। পূর্ণ মানুষ তৈরি হওয়ার পর কি সেই 'হিউম্যান জিনোম'-এর অস্তিত্ব আর থাকে না? মোটেই নয়। সেই জিনোম কিন্তু আমাদের শরীরে সর্বত্র বিদ্যমান।

সত্যিই যদি আমরা মহাশূন্যের বুননকে আরও কাছ থেকে দেখি, তাহলে আমরা 'ইউনিফিকেশন'-এর সংকেত পাব। এটা করার জন্য, আমাদের কোয়াটাস্ ফিজিক্সের সাহায্য নিতে হবে। কোয়াটাস ফিজিক্স আমাদের প্লানক্স ডাইমেনশনস পর্যন্ত পথ দেখিয়ে পৌঁছে দেবে। সেই পথ যাবে প্রকৃতির প্রতিসাম্যের পুনরুদ্ধার পর্যন্ত। যে অকল্পনীয় তাপমাত্রা সময়ের শুরুতে ছিল সর্বব্যাপী এবং আদি ক্ষেত্রের প্রতিসাম্যকে তৈরি করেছিল, সেই তাপমাত্রা আজ আর নেই। তাহলে স্পেসটাইমের গভীরতম স্তরে এখনও কীভাবে পরিব্যাপ্ত থাকতে পারে 'ইউনিফিকেশন'? এখানেই কোয়ান্টাস ফিল্ড থিয়োরি এক মহাজাগতিক সমাধানের সন্ধান দেয়। প্লানক্স ডাইমেনশনস-এ প্রকৃতি মহাবিশ্বের স্ফীতি হওয়ার আগে যে অবস্থায় ছিল— অকল্পনীয় তাপমাত্রায় তার সমতুল্য। সেই জন্য মৌলিক 'সিঙ্গল ফিল্ড'টি আজও বর্তমান এবং বলতে পারি উৎস রয়েছে আমাদের সঙ্গেই। যেমন ধর্মের ঈশ্বর সৃষ্টির পরে ছেড়ে যাননি ভুবনকে।

আমরা যখন মহাশূন্যের কথা ভাবি, ওটা যেন বাইরে আছে অনেক দূরে, যেখানে আকাশ থেকে কয়লার মতো কালো ফাঁকা মহাশূন্য। কিন্তু এই শূন্য আবার রয়েছে আমাদের মধ্যে। কারণ যে অ্যাটম বা পরমাণু দিয়ে শরীর তৈরি, সেই পরমাণুর অধিকাংশ অন্তর জুড়ে শূন্যতা। যদি পরমাণুকে একটা ফুটবল স্টেডিয়ামের মতো বড়ো করে দেখি তাহলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসটি স্টেডিয়ামের কেন্দ্রে থাকবে ছোট্ট মাছির মতো। ফুটবল স্টেডিয়ামের পিছন দিকে যে সস্তার আসনগুলি রয়েছে তার চর্তুদিকে ছায়ার মতো ভাসবে পরমাণুটির ইলেকট্রন মেঘ। উৎস শুধু আমাদের সঙ্গেই নেই— আছে আমাদের মধ্যেও। শুধু আমাদের অনুভব করতে হবে— রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে অনুভব করেছিলেন, 'জাগ্রত বিশ্ব কোলাহল-মাঝে/তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার/পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান/তোমা পানে, ধায় প্রাণ সব কোলাহল ছাড়ি, চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে।।'

কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নিচ্ছে যে মহাবিশ্বের একেবারে অন্ধকার প্রান্তেও রয়েছে কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম যেখানে সর্বদা ফুটছে কোয়ান্টাম উন্মত্ততা। সম্প্রতি স্ট্রিং থিয়োরির প্রবক্তারা বলেছেন— আমাদের মেনে নেওয়া উচিত এই সম্ভাবনা যে প্লানকস ডাইমেনশনসে স্পেস টাইম জুড়ে বোনা আছে কম্পমান 'অন্তর ফাঁস'। আমাদের যে ঘরে বসে 'মা' পুজো করেন, সেটা উলটে দেখা যাবে পিছন দিকটা জুড়ে রয়েছে সুতোর রঙিন ফাঁস। অনেকটা সেইরকম, স্ট্রিং থিয়োরির প্রবক্তরা আরও বলেছেন, স্পেস টাইমের যে চারটি ডাইমেনশন, তাছাড়াও এই 'স্ট্রিং' বা তন্তুগুলির অধিকাংশকেই অত্যন্ত বেশি আঁটসাঁট করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ছয় বা সাতটি গুপ্ত ডাইমেনশনসের ভেতরে।

সেতারের তারের কম্পন হার যেমন নির্ধারণ করে তার ঝংকার, তেমনি একটি সুপারস্ট্রিঙের কম্পনগতি নির্ধারণ করে কী ধরনের কণা তা প্রদর্শন করবে। সাব অ্যটমি পার্টিকল কীভাবে পাচ্ছে তাদের অস্তিত্ব সেটা বোঝার এ এক নতুন পদ্ধতি। এটা বুঝতে পারলে আমরা যাকে 'ফ্যাব্রিক অব স্পেস' বা মহাশূন্যের বুনন বলছি সেটা স্পর্শময় হয়ে উঠে। কিন্তু বাস্তব হলো ব্যাপারটা তে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্তরে ঘটছে তা কিন্তু স্পর্শযোগ্য নয়। এই ক্ষেত্রে এসে স্ট্রিং থিয়োরি হয়ে উঠে নিছক কিছু গাণিতিক বিমূর্ততা। তবে সেই হিসাবে মহাবিশ্ব জুড়ে এক ছন্দময় কম্পন চলছে এটাই মহান তত্ত্ব। প্রাচীন আধ্যাত্মিক ধারণার সঙ্গে মিল খেয়ে যায়। এই ছন্দময় কম্পনকে প্রাচীন ঋষিদের মতো অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

'আমায় তুমি ফেলছে কোন ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি।।'

এখন প্রশ্ন, মহাবিশ্ব ব্যাপী যে মহাজাগতিক কম্পন তাঁর ঠিকানা কি আমরা পেয়েছি? জন হুইলারের মতো বিজ্ঞানীরা বলবেন হ্যাঁ, কিন্তু বহু গণিতবিদ বিজ্ঞানী বলবে না। না— তাঁরা মহাবিশ্বের আরও সূক্ষ্মকণা খুঁজে বেড়াবেন। এই ডিটেকটিভ ফাইলের মধ্যে 'সুযোগ'কে শনাক্ত করে উপায় এর সুত্রগুলিকে আবিষ্কার করতে থাকব। যদিও উদ্দেশ্য থেকে যাবে আমাদের বোধের বাইরে— কেন এই মহাবিশ্ব? কী তাঁর উদ্দেশ্য? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বিজ্ঞান পৌঁছেছে 'মাল্টিভার্স' এবং জটিল কিছু গাণিতিক নির্মাণে। মহাবিশ্বের বির্বতনে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যারা একসঙ্গে আমাদের বন্ধুর মতো, সম্ভব করেছে আমাদের জন্ম এবং বেঁচে থাকার উপায়কে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মহাবিশ্ব শুরুর আগে কী ঘটেছিল? গোড়া বিজ্ঞান বলবে 'কিছুই না'। ঠিক যেভাবে দেকাট সমসাময়িক ধর্মগুরুদের উদ্দেশে এই প্রশ্নটি চাপিয়ে দিয়েছিলেন আগামীদিনে 'বিজ্ঞানের' দিকেও থাকবে প্রশ্নটি?

আমরা সহজে ধারণা করতে পারি না শূন্য থেকে কিছু জন্মাতে পারে। আমাদের জগতের কিছু শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক দর্শনের ভাষায় সৃষ্টির পূর্বে এসেছেন ঈশ্বর, যিনি সৃষ্টিতত্ত্বের অতীত। তার কারণ, সময়ের শুরুর মুহূর্তটি এমন একটি চৌকাঠ, যা আমরা কাছাকাছি কোনো সময়ের মধ্যে পেরোতে পারব বলে মনে হয় না। এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয় বলতে পারে ঈশ্বর, যাঁর প্রকাশ প্রেমে-শ্রদ্ধায়-নৈতিকতায়, সেই ঈশ্বর দেখুক আমাদের আত্মাকে, আর বিজ্ঞান দেখুক আমাদের যন্ত্রসভ্যতাকে। এখানেই ব্যাপারটাকে যদি ছেড়ে দিই, তাহলে দেকাটে'র বিশ্বের মতো আমাদের বিশ্বও দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। স্থূল বস্তুগুলি আসবে পদার্থ বিজ্ঞানের এক্তিয়ারে আর সূক্ষ্মতর দিকটি থাকবে ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য বাস্তব ও বিশ্বাসের মধ্যে 'সাধারণ' ভূমিকে খুঁজে বার করা। যদি আমরা সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করি বিজ্ঞান সমর্থিত ধারণায় ঈশ্বর আছেন এবং আছেন আমাদের মধ্যেই, তাহলে এই জগৎ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় না। এখান থেকেই প্রশ্ন হলো, ইশ্বর কেমন? কী রকম তাঁর স্বভাব? বিজ্ঞান উত্তর দিচ্ছে মহাবিশ্বে সমস্ত এনার্জির যোগফল শূন্য। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম মহাবিশ্ব অবশ্যই শুরু হয়েছিল শূন্যের মূল্য থেকে। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, মহাবিশ্বের শূন্য কিছু বেশি শূন্যতার থেকে যতই অবাস্তব লাগুক ব্যাপারটাকে (জিরো অ্যামাউন্টস টু মোর দ্যান নাথিং)। এই প্রশ্নের উত্তরে যাওয়া যাক বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক চার্লস সিফ এর কাছে। তিনি শূন্যের জীবনী লিখেছেন— 'জিরো দ্য বায়োগ্রাফি অব আ ডেঞ্জারাস আইডিয়া' প্রহেলিকাময় শূন্যের জন্ম ভারতবর্ষে। সপ্তম শতকে ব্রহ্মগুপ্তের মতো গণিতজ্ঞরা শূন্যকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন পজিটিভ ও নেগেটিভ সংখ্যার অলঙ্ঘ্য কেন্দ্র হিসেবে। আমরা যদি শূন্য থেকে কোনো পজেটিভ সংখ্যাকে বাদ দিই, ওই সংখ্যাটি নেগেটিভ হিসেবে ফিরে আসে। আবার শূন্য থেকে কোনো নেগেটিভ সংখ্যাকে বাদ দিলে ওই সংখ্যাটিই ফিরে আসে পজিটিভ হিসাবে।

বহুকাল আগে গণিতবিদরা ধরতে পেরেছিলেন যে শূন্যের সঙ্গে অনন্তের এক অপরিবর্তনীয় সম্পর্ক আছে। যদি কোনো কিছুকে অনন্ত দিয়ে ভাগ করি, তাহলে ভাগফল হিসেবে আমরা পাই শূন্যকে। যদি কোনো কিছুকে ভাগ করি শূন্য দিয়ে ভাগফল হবে 'অনন্ত'। 'পজেটিভ' এবং 'নেগেটিভ' 'অনন্ত এর মধ্যে শূন্য বা জিরো হচ্ছে একটি ভ্যানিশিং পয়েন্ট অর্থাৎ বিলয়মান বিন্দু।

ষোড়শ শতকে শূন্য পেল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সমস্ত উচ্চতর গণিতের সব থেকে জরুরি সংখ্যা রূপে। পদার্থ বিজ্ঞানী ডেভিড বস-এর দার্শনিক ভাবনা শূন্যে থেমে থাকেনি। তিনি ভাবতে পেরেছিলেন এমন কিছু যা শূন্যের অতীত। এর নাম দিয়েছিলেন, যা ধারণ করে সমস্ত মাল্টি ডাইমেনশনাল প্রি-স্পেস সম্ভাবনার সমবিন্দু অস্তিত্বকে। বস্ মনে করেন, বস্তুচেতনা ও চেতনা এই একই ইপপ্লিকেট অর্ডারের প্রোজেকশন। বস্ জানাচ্ছেন যে, ইমপ্লিকেট, অর্ডার সারা মহাবিশ্বকে জড়িয়ে আছে হলোগ্রাফিক ভাবে। যার প্রতিটি অংশে মহাজাগতিক জিনোমের প্রতিধ্বনি। যেমন মানব দেহের প্রতিটি কোষের মধ্যে থাকে সমস্ত মানুষটির ব্লুপ্রিন্ট। তেমনি মহাবিশ্বের প্রতিটি বুননের মধ্যে থাকে এর ব্লু-প্রিন্ট।

কে তৈরি করল মহাবিশ্বের এই বিস্ময়কর প্রতিসাম্য বা সিমেট্রি, যে প্রতিসাম্যের সৌজন্যে বালুকণার থেকেও ক্ষুদ্রতর অণুর মধ্যে দেখা সম্ভব সমস্ত মহাবিশ্বকে। এই যুক্তিগ্রাহ্য ধারণায় বিশ্বাস করতে হলে আমাদের মেনে নিতে হবে বস্-এর 'ইমপ্লিকেট অর্ডার' এর মতো কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছেই এবং সেটাই বহন করছে চেতনার মহাজাগতিক সম্ভাবনাকে। সেই বিশ্বাস থেকেই আমরা উঠতে পেরেছি সেই রকেট যা আমাদের নিয়ে যাবে 'বিগ ব্যাং'-এর ওপারে— অর্থাৎ কী হয়েছিল তার আগে। আমরা উপলব্ধি করছি মহাজাগতিক এই বিপুল মর্যাদা, জাঁকজমক কীভাবে উৎসারিত হয়েছে তার ঠিকানা 'শূন্য' বা 'জিরো' থেকে। পৃথিবীর কোনো বাড়ির নাম্বার 'জিরো' হতে পারে না কিন্তু মহাবিশ্বের আদি নিলয়ের ঠিকানা কিন্তু 'শূন্য'।

সমস্ত ধর্মতত্ত্ব গণিততত্ত্ব, পেরিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে একটা ধারণা আছে সেটি হলো এই যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর সর্বব্যাপী হয়ে বিরাজমান তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এবং চালিয়ে যাচ্ছেন এখনও তাঁর সৃষ্টির কাজ। একথা অবশ্য আমরা আগেই মেনে নিয়েছিলাম যে সৃষ্টিকর্তা আমাদের সামনে কখনও অভিজ্ঞতালব্ধ রূপে প্রকাশিত হবেন না। কিন্তু তবু যুগে যুগে তাঁকে শ্রদ্ধার যোগ্য বলে প্রার্থনা করেছি, তাঁকেই করেছি আমাদের আশা ও আস্থার পাত্র। আমরা দেখলাম এই প্রথম বিজ্ঞান সমর্থন জানাচ্ছে সমস্ত ধর্মের 'একটি উৎস' কে। আমরা জেনেছি এক বিমূর্ত সত্তার কথা যা সমস্ত মহাবিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। 'চেতনা' যে অপরিহার্য অঙ্গরূপে জড়িয়ে আছে সেই সর্বব্যাপী সত্তার সঙ্গে।

বিজ্ঞান কিন্তু থেমে নেই। বিজ্ঞান সব সময় এগিয়ে চলেছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও কত নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বিজ্ঞান। তখন হয়তো আরও স্পষ্ট উত্তর পাব আমাদের প্রশ্নের। এখন এইটুকু আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করার যে, ধর্মের অন্তরের মধ্যে বিজ্ঞান এসে ঢুকেছে এবং পরস্পরের প্রতি তারা উষ্ণ, আগ্রহী ও উৎসাহী। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। বিজ্ঞানের আলো পড়ছে ধর্মের অন্তরে। এই প্রথম আমরা জানতে পারছি বৈজ্ঞানিক যুক্তির সমর্থনে যে আমরা 'উৎস' থেকে বিচ্ছিন্ন নই।

তথ্য : (১) উপাসনা ও প্রার্থনার শক্তি— স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
(২) বিজ্ঞানে ঈশ্বরের সংকেত— মণি ভৌমিক।

বীর সাভারকরের কারাবাসের কাহিনি স্বদেশসেবায় যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে

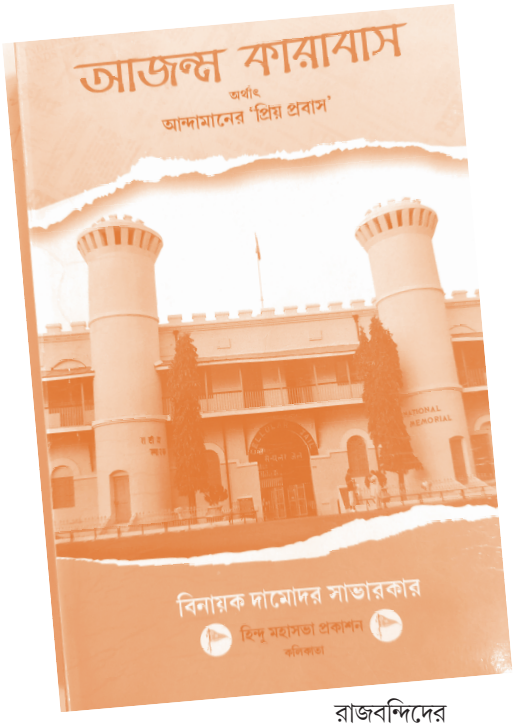

বিজয় আঢ্য

বিনায়ক দামোদর সাভারকর এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধাবস্থা আদর্শের জন্য নানান আত্মত্যাগের কাহিনিতে ঋদ্ধ। তাঁর অসামান্য বীরত্ব, ত্যাগ স্বীকার ও আত্মোৎসর্গের জন্য ভারতবাসী তাঁকে 'বীর' আখ্যায় ভূষিত করেছে। তিনি একাধারে অসীম সাহসী বিপ্লবী, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, লেখক, রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজ সংস্কারক। মরাঠি ভাষায় রচিত 'মাজি জন্মঠেপ' তাঁর ৫০ বছরের দ্বীপান্তর বা কারাবাসের দিনলিপি। ইংরেজিতে অনুদিত গ্রন্থটির নাম 'The Stories of my transportation for life' এবং বাংলায় 'আজন্ম কারাবাস' অর্থাৎ আন্দামানের প্রিয় প্রবাস।' ১৯২৭ সালে প্রথম সংস্করণের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি নিঃশেষিত হয়ে যায়। কিন্তু সেসময় দ্বিতীয় সংস্করণটি আলোর মুখ দেখেনি। আকস্মিকভাবে বোম্বাই সরকার এই পুস্তক নিষিদ্ধ করে দেয়। ১৯৪৭ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে ওই বছরই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলা অনুবাদের সময় অনুবাদক সুকুমার নন্দী ইংরেজি ও হিন্দি— দুটি অনুবাদ গ্রন্থেরই সাহায্য নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

এই গ্রন্থের রচনার কারণ হিসেবে সাভারকর বলেছেন, নিজের মনের কথা প্রিয় ও পরিজনদের কাছে জানানো স্বভাবজাত ধর্ম। যদিও পরিস্থিতির কারণে তাঁর ইচ্ছাকে সংযত রাখতে হয়। জেল থেকে মুক্তির পর তাঁর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাভারকর জানিয়েছেন, এই পুস্তকে যেসব চিন্তা, অনুভূতি ও ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে, তা আন্দামানের কারাগারে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশমাত্র। আন্দামানের সেলুলার জেলের অসহনীয় অত্যাচার, অসহ্য নিগ্রহ ও নির্যাতনের কাহিনিই শুধু নয়, জেলে রাজনৈতিক বন্দিদের নিয়ে জেল-বিধি সংস্কারের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন ও চূড়ান্ত অবস্থায় সহবন্দিদের নিয়ে ধর্মঘট করা, সাধারণ কয়েদিদের শিক্ষাদানের চেষ্টা, জেল লাইব্রেরি গঠন, হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি কলমের অভাবে ইটের টুকরো, কাঁটা প্রভৃতি দিয়ে জেলের দেওয়ালে কবিতা লেখার অবিশ্বাস্য প্রয়াসের কথাও লিখেছেন।

হঠাৎ একদিন 'কেশরী' নামে মারাঠি পত্রিকার একটি ছেঁড়া পাতা হাতে এসে পড়ায় সাভারকরের অনুভূতি— 'আমার বেশ কৌতুক বোধ হলো।' জেলখানায় স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তাঁর অনুভূতি—'এই অসহায় অবস্থার মধ্যে নৈরাশ্যের বেড়িতে বাঁধা দেখে সেই ঊনিশ বছরের তরুণীর মনে না জানি কত ব্যথাই না বেজেছিল। ...পঞ্চাশ বছর অর্থাৎ চিরজন্মের মতো বিচ্ছেদের আগে এই তো শেষ বিদায়।' সেসময় তাঁর 'নিজস্ব বলতে ছিল, 'আমার চশমা আর পকেট সাইজ একখানা গীতা।' আন্দামানে 'প্রথমে আসা রাজবন্দিদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙ্গালি'। তাঁর সহ-কারাবন্দিদের মধ্যে ছিলেন 'কলিকাতার মানিকতলার বোমার মামলার দণ্ডিতেরা এবং এলাহাবাদের 'স্বরাজ্য' পত্রিকার সম্পাদক।' অন্যান্য সহ-রাজবন্দিদের মধ্যে অন্যতম হলেন উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, ভাই পরামানন্দ বাবু জ্যোতিষচন্দ্র, লালা রামচরণ দাস প্রমুখ।

'ক্রমে আমরা সুসংহতভাবে কাজ করার জন্য এক কেন্দ্রীয় সংগঠন একটা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলাম। লাইব্রেরির বেশিরভাগ বই ছিল ইংরেজি। সব বইই যত্নসহকারে পাঠ করেছিলাম। যোগবশিষ্ঠ গ্রন্থটিকে আমি বেদান্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ বলে মনে করেছিলাম।' আন্দামানে যাওয়ার দেড়-দু বছর পরে (১৯৯৩) জেলে বলপূর্বক ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ উত্থাপন করেন। খ্রিস্টান মিশনারি আর মুসলমান মৌলভিরা বিধর্মীদের, পাপীতাপীদের আত্মার মুক্তির

জন্য ধর্মান্তরিত করে চলছিল। সেরকমই কোনো হিন্দু, তারা যতই অধঃপতিত হোক না কেন, তাদের হিন্দু ধর্ম ছেড়ে দিতে রাজি হওয়া যায় না। শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিতদের ফিরিয়ে নিতে হবে। শুদ্ধি আন্দোলনের এই হচ্ছে একমাত্র প্রধান যুক্তি। ১৯২১-২২ সাল পর্যন্ত আন্দামান জেলে এবং পরেও এই আন্দোলন চালিয়ে গেছেন।

সৌভাগ্যক্রমে এসময় লোকগণনা আরম্ভ হয়েছিল, আন্দামানেও তা শুরু হলো। গণনা শেষ হওয়ার পর তিনি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, শিখ-সহ সকল সম্প্রদায় জাতীয়তার ঘরে 'হিন্দু' কথাটার উল্লেখ করেছেন। তাঁর সহ-বন্দিদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত হলেও তাঁদের দেশপ্রেম কারও চাইতে কম ছিল না। তাদের দেশপ্রেমের পিছনে বুদ্ধিগত শক্তি বৃদ্ধি করতে তিনি ও তাঁর পুরাতন বন্ধুরা তাদের শিক্ষা দান কার্য শুরু করলেন। জেলে তাঁর বাঙ্গালি বন্ধুরা হিন্দি মোটেই উন্নত ভাষা নয় কিংবা এই ভাষায় কোনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য নেই বলে বিরোধিতা করলেও শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দির গুরুত্ব প্রসঙ্গে সকলে একমত হলেন। এমনকী শিখরাও বুঝলেন যে হিন্দি শুধু তাঁদের রাষ্ট্রভাষা নয়, ধর্মীয় ভাষাও। যে আন্দামান উর্দু ছাড়া আর কোনও ভাষা জানতো না, এখন ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও হিন্দি সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিল।' 'এ পরিবর্তন ঘটাবার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আমার জেলখানার সহকর্মী ও উপনিবেশে বসবাসকারী নাগরিকদের।'

তিনি প্রথম যখন আন্দামানে এসেছিলেন তখন জেলখানার ভিতরে ও বাইরে ছিল এক কথায় পাঠানরাজ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে পুরনো কয়েদি পাঠানরা সবদিকে প্রভুত্ব করতো। কিন্তু বন্দিজীবনের শেষ দিকে পাঠানরাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল আর তার বদলে 'হিন্দুরাজ' স্থাপিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার আন্দামানকে কয়েদি উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত হলেন; কেননা গত দশ বছর ধরে তাঁরা যা চেষ্টা করছিলেন তা সফল হলো। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি চিন্তিতও ছিলেন। তিনি গোড়া থেকেই আন্দামানের বন্দি উপনিবেশ তুলে দেওয়ার বিরোধী। তাঁর যুক্তি— কানাডা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় যেমন গোড়ার দিকে ইংল্যান্ড থেকে বন্দিদের পাঠানো হতো এখানেও তেমনি পাঠানো হতে থাকুক। ক্রিমিনালদের জেলখানায় পুরে রাখা জাতীয় অপচয়। জেলখানায় অসহ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্যেও তিনি তাঁর জীবনব্রত থেকে বিচ্যুত হননি। জেলের সহ-বন্দিদের 'এক দেব, এক দেশ, এক আশ' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যা তিনি মাত্র এগারো বছর বয়সে শপথ নিয়েছিলেন।

এই গ্রন্থটির শেষাংশে সুদীপ দাসের লেখা 'সাভারকর আক্রোশীদের জ্ঞানের আলো' সংযোজনটি সময়োচিত। বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর সম্বন্ধে সামান্যতম বিষয় না জেনেও দেশের একশ্রেণীর মানুষ, এমনকী তকমাধারী বিদ্বজ্জনেরাও যেভাবে 'আপনাদের সাভারকর তো ব্রিটিশের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন' বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছেন, তা দেশভক্ত মানুষকে মর্মাহত করেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানার অনিচ্ছা বা অজানা থাকার কারণেই তারা জানেন না যে সাভারকরের গ্রেপ্তার পর্ব সম্পূর্ণ অবৈধ, অনৈতিক ও অজুহাতসর্বস্ব। এমনকী আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী। 'Mercy Petition' বা মার্জনা ভিক্ষা বলে যেটা বলা হয়, সেটা আসলে বন্দিনীতি মেনে না চলার এক দলিল। বস্তুত মুক্তির শর্ত হিসেবে তাঁকে যা বলা হয়েছিল, ১৯২০ সালে লেখা এক চিঠিতে (Echo of the Andaman গ্রন্থের ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তা তিনি মানতে রাজি হয়েছিলেন। 'মার্জনা ভিক্ষা' যে ছিল একটা কৌশল এবং সেই কৌশলের নেপথ্যে ছিল এক অন্য ইতিহাস— এটা অনেকে বুঝতে চাননি। কী সেই ইতিহাস? সাভারকরের ছোটো ভাই নারায়ণরাও সাভারকর ১৯২০ সালে বন্দিমুক্তি প্রসঙ্গে গান্ধীজীর হস্তক্ষেপ চান। গান্ধীজী তাকে সহজ পরামর্শ দেন যে ব্রিটিশের কাছে ক্ষমা চাইলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে। এরপর সাভারকর উন্নাসিকরা কী বলবেন?

ওই নিবন্ধের লেখক ১৯১৩ সালের ভারত সরকারের 'হোম মেম্বার' স্যার রেজিনাল্ড হেনরি ক্র্যাডাক-এর একটি রিপোর্ট (৫২৭-৫২৮ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে তিনি সাভারকর ও তাঁর সহযোগী বিপ্লবীদের মুচলেখা দাখিলের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাভারকর তাঁর সহযোগীদের বোঝান যে মুচলেখার সুযোগ নিয়ে যেনতেনপ্রকারেণ মুক্তি। এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি জেলমুক্তির পর কাকোরি ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ মুচলেখার মূল্য হলো দেশপ্রেম— দেশ ও জাতির জন্য অসম্মানের নয়।

প্রায় একশো বছর আগে (১৯২৭) প্রকাশিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করে সুকুমার নন্দী (বর্তমানে প্রয়াত) বঙ্গভাষী হিন্দুসমাজ বিশেষত হিন্দু যুবসমাজকে স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গের প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ সাবলীল, বাক্য বিন্যাস সরল, 'কড়মড় শব্দ'-এর মতো দেশীয় ভাষার ব্যবহার পাঠককে সহজেই আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষকে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠার জন্য যে স্বাভিমান বোধের প্রয়োজন, গ্রন্থটি তা জাগরণে সহায়ক হবে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে মিথ্যার বেসাতি করে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের আত্মবলিদানকে খর্ব করতে যারা উদ্যোগী গ্রন্থটি তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। অনুবাদক এইজন্য ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কাম্য, তবে বিক্রয় মূল্য একটু কম হলে ভালো হতো।

পুস্তকের নাম : আজন্ম কারাবাস— বিনায়ক দামোদর সাভারকর।
প্রকাশক : হিন্দু মহাসভা প্রকাশন, কলকাতা-১২।
মূল্য : ৫৫০ টাকা।

দেবতাদের অহংকার

দেবতা ও অসুরদের মধ্যে কোনোকালেই যেমন মিল ছিল না, তেমনই কেউ কাউকে দেখতেও পারত না। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে চিরদিনই বিবাদ। স্বর্গে বাস করে বলে দেবতারা নিজেদের বড়ো মনে করে। মর্ত্যের অসুররা মনে করে, আমরাই-বা ছোটো কীসে। ওরা আমাদের

চাইতে বড়ো, একথা আমরা মানি না। বাহুবলই বড়ো বল। আমরা যুদ্ধ করে স্বর্গ জয় করব। দেবতারা করবে আমাদের দাসত্ব। এই মনোভাবের ফলে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। যুদ্ধে দেবতারা প্রায়ই জয়ী হতো। অসুররাও মাঝে মাঝে দেবতাদের স্বর্গ থেকে হটিয়ে দিত। তাদের ওপর অত্যাচার করত।

একবার দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একটা ভয়ানক যুদ্ধ হলো। কার জয়, কার পরাজয় ঠিক করা শক্ত হলো। কখনো দেবতারা অসুরদের হটিয়ে দেয়। ফিরে এসে আবার জোর কদমে আক্রমণ চালায়। হঠাৎ উভয় পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভীষণ যুদ্ধ শুরু করল। কেউ হটে না। জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। এমন সময় দেবতাদের মনে হলো, তাদের শরীর ও মনে নতুন শক্তি এসেছে। এই মনে হতেই তারা পূর্ণ উদ্যমে অসুরদের আক্রমণ করল। অসুররা এবার পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। যুদ্ধ জয় করে দেবতারা খুশি। তারা বলে বেড়াতে লাগল— আমরা কত বড়ো। আর আমাদের কত শক্তি, অসুরদের আমরা হারিয়ে দিলাম।

কিন্তু তারা তো আর জানতো না যে ব্রহ্মই তাদের শক্তি, ব্রহ্মই তাদের বল। সূর্যের আলোতেই চাঁদের আলো। চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই। দেবতারা অহংকারে মত্ত হলো। ব্রহ্ম সব দেখলেন, সব বুঝলেন। তিনি ভাবলেন— দেবতারা ভুল পথে চলছে, তারা আমার প্রিয়। আমি তাদের জ্ঞান দান করব। সত্যের আলো দেখাব এদের, শক্তি কোথায় তা বুঝিয়ে দেব। তা না হলে দেবতারা অসুরদের মতোই অহংকারে নিজেদের সর্বনাশ করবে।

সেদিন স্বর্গে যুদ্ধ জয়ের উৎসব হবে। যেখানে উৎসব হবে সেখানে দেবতারা এসে উপস্থিত। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, অদিতি সবাই আছে। উৎসব শুরু হবে হঠাৎ এক অপূর্ব আলোকে উৎসবক্ষেত্র যেন ভরে উঠল! এ আলোর বর্ণনা করা যায় না। এমন আলো দেবতারা আগে কখনো দেখেনি। সকলে বিস্মিত হয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল। দেবতারা মনে করত ত্রিভুবনে তাদের অজানা কিছু নেই, কিন্তু আজ তাদের মনে হলো, এ আলোর সন্ধান তারা জানে না। তারা মনে মনে লজ্জা পেল এবং ভেবেচিন্তে ঠিক করল, এই অজানাকে জানতেই হবে। দেবলোকে অগ্নি সকলের অগ্রণী। সে অনেক কিছুই জানে, সব খবর সংগ্রহ করবার শক্তি তার আছে। দেবতারা তাকে ধরে বসল। তারা সকলেই বলল, যে এক আশ্চর্য পুরুষের কাছ থেকে আলো আসছে, তার তত্ত্ব আমাদের জেনে এসে বলতে হবে।

অগ্নি নিজের ক্ষমতায় অতি বিশ্বাসী। এবার আবার দেবতাদের প্রতিনিধি হওয়ায় সে অহংকারে ফুলে উঠল। অগ্নি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কাছে এল। সেই পুরুষ অগ্নিকেই প্রশ্ন করলেন, কে তুমি? কী তোমার ক্ষমতা? অগ্নি সদর্পে জবাব দিল, আমি অগ্নি। পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তা আমি পোড়াতে পারি। সেই পুরুষ একগাছি ঘাস অগ্নির সামনে রেখে বললেন, এই ঘাসগুলি পোড়াও তো! কিন্তু কী আশ্চর্য, অগ্নি শত চেষ্টা করেও ঘাসগুলিকে পোড়াতে পারল না। সে বিফল হয়ে ফিরে এল। এবার দেবতারা বায়ুকে ধরল। বায়ু এল সেই পুরুষের কাছে। আবার একই প্রশ্ন, একই কাজ করতে বলা হলো। বায়ুও বিফল হয়ে ফিরে এল।

অগ্নি ও বায়ুকে বিফল হতে দেখে দেবতাদের ভয় হলো। তাড়াতাড়ি দেবরাজ ইন্দ্র করজোড়ে তাঁর সামনে এগিয়ে আসতেই সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইন্দ্র হতভম্ব। ঠিক সেই সময় হৈমবতী ঊষা আকাশপথে নেমে এলেন। ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন— মা, কে এই আশ্চর্য পুরুষ? উমা জবাব দিলেন, ইনি ব্রহ্ম, ইনিই পরমেশ্বর। ইনি সকলের বড়ো। এই বিশ্বভুবন তিনিই। তিনি শক্তি তাঁর শক্তিতেই সব চলছে। তিনিই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন, ইচ্ছা করলেই আবার বিশ্বকে ধ্বংস করতে পারেন। তোমরা দেবতারা বৃথা অহংকার কর। তাঁর শক্তিতে তোমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছ।

ইন্দ্র উমাকে প্রণাম করে দেবতাদের কাছে ফিরে এলেন। তিনি দেবতাদের কাছে ব্রহ্মের কথা জানালেন। ব্রহ্মের চরণে প্রণাম জানিয়ে তাঁর জয়গান করে দেবতারা সেদিন বিজয় উৎসব শেষ করল।

শ্যামাপদ সরকার

ভারতের বিপ্লবী

নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বিপ্লবী নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৮৯২ সালে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের খোয়েরডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। মাদারিপুর হাই স্কুলের ছাত্রাবস্থায় ১৯১০ সালে মদারিপুর সমিতির বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার নীরদ হালদারকে গুলি করে হত্যা করেন। ওড়িশা উপকূলে জার্মান জাহাজ ম্যাভেরিক থেকে বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজে এবং বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়িবালামের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর গুরুতর আহত হয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ৩ ডিসেম্বর বালেশ্বর জেলে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন।

জানো কি?

- শেকসপিয়ার প্রথম জীবনে লন্ডনের গ্লোব থিয়েটারে গাড়ি পাহারার কাজ করতেন।
- সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত দেশ হলো ডেনমার্ক।
- ভারতের উদ্যান নগরী বলা হয় লখনউ শহরকে।
- মোনালিসা ছবির মডেল ছিলেন ইসাবেলা নামে এক মহিলা।
- প্রথম বাঙ্গালি ইঞ্জিনিয়ারের নাম নীলমণি মিত্র।
- কেরল রাজ্যে পুরুষদের চাইতে মহিলাদের সংখ্যা বেশি।

ভালো কথা

দাদার শ্রদ্ধা

আমার দাদা খুব ভালো। কিন্তু দাদার একটি বদ অভ্যাস ছিল, তাহলো হাতের চেয়ে পা বেশি চলে। জিনিসপত্র পা দিয়ে সরিয়ে দেয়। আমি কিছু বললেই আমার সঙ্গে তর্ক করে। একদিন ঠাকুমা বললেন, কোনো কিছু পা দিয়ে সরাতে বা পা ঠেকাতে নেই। সব জিনিসের মধ্যেই ঈশ্বর থাকেন। সামান্য ঝাঁটাতেও পা লাগাতে নেই। একবার একজন পা দিয়ে বিড়ালের মাথায় আদর করছিল। তা দেখে মা সারদা তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ওর মধ্যেও ঈশ্বর আছেন আর মাথা হলো গুরুস্থান, পা লাগাতে নেই, বিড়ালটাকে প্রণাম কর। ঠাকুমা গল্পটা খুব সুন্দর করে বলেছিলেন। দাদাকে বললেন, এই জন্মে হাতের সঠিক ব্যবহার না করলে পরের জন্মে ঈশ্বর আর হাত দেবেন না। সেদিন থেকে দাদা আর কোনো জিনিসকে পা লাগায় না। কোনো কারণে পা লেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করে। দাদা এখন সব জিনিসকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে।

অপর্ণা মাহাত, একাদশ শ্রেণী, বামনডি, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ত্যু কা অ ল	(১) থা অ ল পা কূ র
(২) চ চা ল ল	(২) সা মৃ গ অ ত র

৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) গুরুদক্ষিণা (২) চালচলন

৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) মণিকাঞ্চনযোগ (২) সমন্বয়সাধন

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, মালদা। (২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯ (৩) শুভম সরকার, বেলঘড়িয়া, কল-৫৬। (৪) পূজা সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

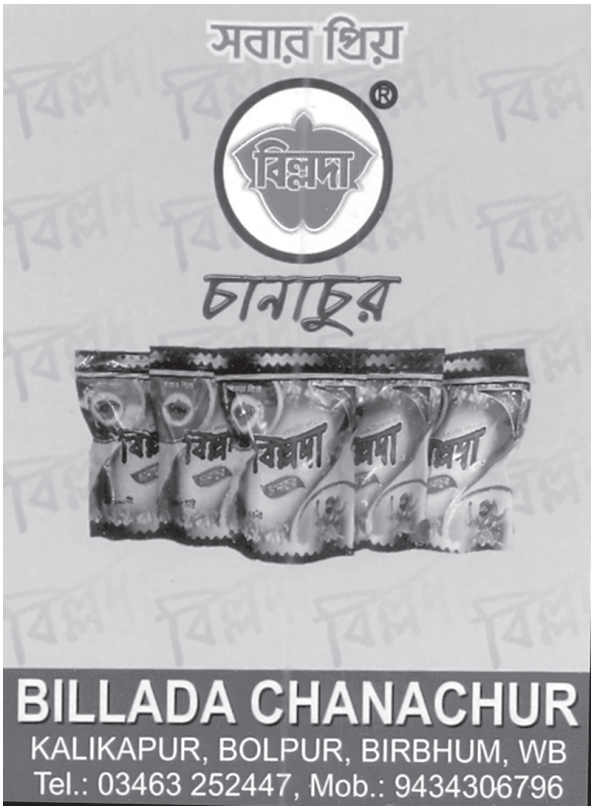

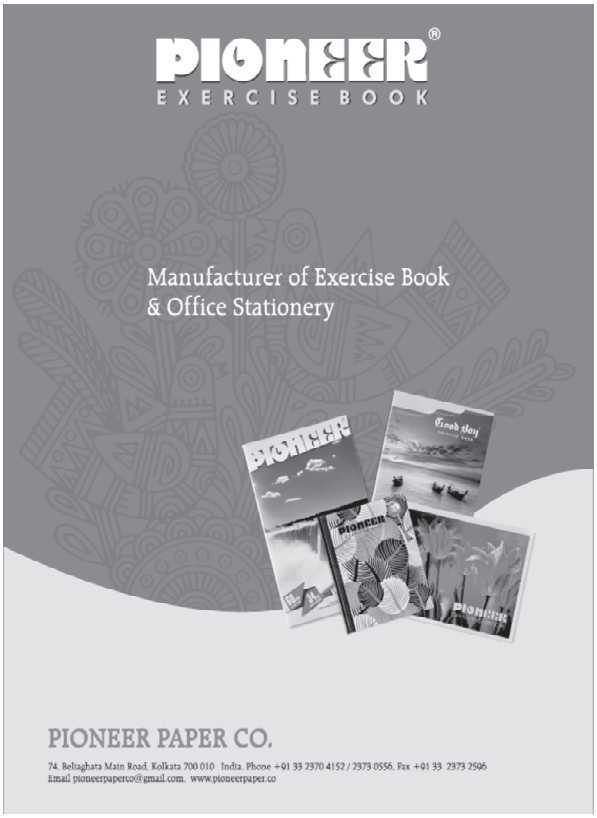

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

জেনারেল কারিয়াপ্পা

অসীম সাহসিকতার জন্য যাঁকে শত্রুরাও সমীহ করে চলতেন

ফিল্ড মার্শাল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সেনাবাহিনীর মাত্র দুজন ব্যক্তি সফলভাবে এই সর্বোচ্চ সামরিক পদের অধিকারী হয়েছেন। একজন স্যাম মানেক'শ এবং অন্যজন জেনারেল কোদান্দেরা মাদাপ্পা কারিয়াপ্পা। মজার বিষয় হলো, ১৫ জানুয়ারি 'সেনা দিবস' হিসেবে পালিত হয় কারণ ১৯৪৯ সালে এই দিনে কারিয়াপ্পা সেনাবহিনীর প্রথম ভারতীয় কমান্ডার-ইন- চিফ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনী বিশ্বের অন্যতম শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নির্ভীক সেনাবাহিনী। অকুতোভয় সেনা জেনারেলদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। এই জেনারেলদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা। তাঁর দেশপ্রেম ও শৃঙ্খলার সামনে আজও আমরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করি। ১৯২২ সালে একটি স্থায়ী কমিশন পাওয়ার পর সে পরবর্তীকালে ফিল্ড মার্শাল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট পদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এটি একটি 'ফাইভ স্টার র‍্যাঙ্ক' সম্মান। ক্যারিয়াপ্পা ১৮৯৯ সালের ১৮ জানুয়ারি কর্ণাটকের কুর্গের শনিবরসাথীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর বাবা কোডানেরা মাদিকেরিতে একজন রাজস্ব আধিকারিক ছিলেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে এমন অনেক কাহিনি রয়েছে যা তাঁর এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের উপর আলোকপাত করে।

১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন বলদেব সিংহ। তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে কর্মরত নাথু সিংহকে ভারতের প্রথম কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু নাথু সিংহ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন ঊর্ধ্বতন হিসেবে কারিয়াপ্পা ওই পদে সবচেয়ে বেশি যোগ্য। নাথু সিংহের পরে রাজেন্দ্র সিংহকেও এই পদ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনিও কারিয়াপ্পার সম্মানে সেই পদটি গ্রহণ করেননি। তারপর ১৯৪৮ সালে ৪ ডিসেম্বর কারিয়াপ্পাকে প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ করা হয়।

কারিয়াপ্পা লেহকে ভারতের অংশে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে তিনি সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান হিসাবে রাঁচিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে কাশ্মীরের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় তাঁকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডুডলি রাসেলের জায়গায় দিল্লি ও পূর্ব পাঞ্জাবের জিওসি-ইন-চিফ করা হয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রথমে নওসেরা ও ঝাঙ্গার দখল নেয়। তারপর জোজিলা, দ্রাস ও কার্গিল থেকে আক্রমণকারীদের পিছু হঠতে বাধ্য করে। তাঁর ছেলেকে যথাসম্মানে হস্তান্তর করেছিল পাকিস্তান। ঘটনাটি ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়কার। অবসর নেওয়ার পর কর্ণাটকের মেরকারায় নিজের বাড়িতেই থাকতেন জেনারেল ক্যারিয়াপ্পা। এই সময়ে তাঁর ছেলে নন্দা কারিয়াপ্পা ভারতীয় বিমানবাহিনীতে একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। যুদ্ধের শেষ দিনে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নন্দা কারিয়াপ্পা পাকিস্তান সেনার বিরুদ্ধে বোমা হামলার একটি মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁর বিমানটি ভেঙে পড়ে এবং তাকে পাকিস্তান সেনা বন্দি করে। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জেনারেল কারিয়াপ্পার অধীনে সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছিলেন। নন্দার পরিচয় জানার পর রেডিয়ো পাকিস্তান ঘোষণা করে যে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নন্দা কারিয়াপ্পা তাঁদের হেফাজতে আছেন এবং নিরাপদে আছেন। আইয়ুব খান ভারতে পাকিস্তানি হাইকমিশনারের মাধ্যমে জেনারেল কারিয়াপ্পাকে প্রস্তাব দেন যে তিনি চাইলে তাঁর ছেলেকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। কারিয়াপ্পা সেই প্রস্তাব সবিনয় প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন যে নন্দু দেশের ছেলে। অন্যান্য যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করা হয় তাঁর সঙ্গেও যেন সেরকম আচরণ করা হয়। তাঁকে মুক্তি দিতে চাইলে সকল যুদ্ধবন্দিকেও মুক্তি দিতে হবে।

শত্রুরাও কারিয়াপ্পাকে সমীহ করে চলতেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় সেনাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে কারিয়াপ্পা সীমান্ত এলাকায় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এসময় তিনি সীমান্ত পেরিয়ে 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এ প্রবেশ করেন। নন্দু কারিয়াপ্পা তাঁর বাবার জীবনীতে লিখেছেন, 'তাঁকে দেখে পাকিস্তানি কমান্ডার সেখানে থামতে নির্দেশ করেছিল, অন্যথায় তাঁকে গুলি করা হবে। ভারতীয় সীমান্ত থেকে কেউ একজন চিৎকার করে বলে ওঠেন, ইনি জেনারেল কারিয়াপ্পা। তাঁর নাম শুনে পাকিস্তানি সেনারা অস্ত্র নামিয়ে দেয়। কর্তব্যরত অফিসার এসে জেনারেল কারিয়াপ্পাকে অভিবাদন জানায়'। জেনারেল কারিয়াপ্পা সেনাবাহিনী থেকে ১৯৫৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে হাই কমিশনার হিসেবে কাজ করেছিলেন।

(নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের সৌজন্যে)

ধন্য হে ঋষিবর—রাষ্ট্রতপস্বী মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী)

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

ছ-সাত বছরের একটি ছোট্ট ছেলে বাড়ির উঠোনে আপন মনে খেলা করছে। মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। ভেতর থেকে শুনতে পেলেন বাইরে থপ থপ শব্দ। জিজ্ঞাসা করলেন, 'মধু কী করছ।' শিশুর সরল উত্তর, 'খেলছি'। একটু পরে আবার সেই শব্দ থপ থপ। মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মধু কী করছ?' মধু আবারও উত্তর দেয়, 'খেলছি'। 'খেলছে তো বটে, তবে এমন থপ্ থপ্ শব্দ আসছে কোথা থেকে?' —মা বললেন। মধু বলে— 'ও কিছু নয়, মাটিতে পা ঠুকছি, তাই। মা সঙ্গে সঙ্গে রান্না ফেলে বাইরে বেরিয়ে এসে মধুকে জড়িয়ে ধরে বললেন— 'ছিঃ, বাবা, ওভাবে কি মাটিতে পা ঠুকতে আছে? মাটি যে আমাদের মা। মায়ের বুকে পা ঠুকে কষ্ট দিতে নেই। ভালো ছেলেরা কখনও মাকে কষ্ট দেয় না।' তৎক্ষণাৎ মধুর মাটিতে পা ঠোকা বন্ধ হয়ে গেল। সেদিন থেকে মধুর মনে গেঁথে গেল মা'র দেওয়া ছোট্ট উপদেশ— 'মাটি আমাদের মা।'

এই শিশুটিই একদিন বড়ো হয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান অর্থাৎ সরসঙ্ঘচালক হয়েছিলেন। নাম মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর। সেদিনের মায়ের দেওয়া ছোট্ট উপদেশকে পাথেয় করে সারাজীবন শুধু নিজেই যে দেশমায়ের সেবা করে গেছেন তা নয়, কত শত মানুষের মনে দেশভক্তির দীপ জ্বালিয়ে গেছেন তার হিসেব নেই। ১৯০৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি মহারাষ্ট্রের এক অখ্যাত গ্রাম গোলওয়ালিতে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত মেধাবী মাধব দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষা সমাপ্ত করে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন। ছাত্ররা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে গুরুজী ডাকত। মাধব তাঁর বাবা-মায়ের একমাত্র জীবিত সন্তান। তাই তাদের ইচ্ছা ছেলে বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করুক। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। মাধবের সঙ্গে যোগাযোগ হলো কাশী রামকৃষ্ণ মিশনের এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। ধীরে ধীরে মাধবের মনে দেখা দিল চরম বৈরাগ্য। ঈশ্বরকে জানার ও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় হিমালয়ে গিয়ে সাধনা করার সংকল্প করলেন। তাই চাই কোনো সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা। হঠাৎ একদিন কাউকে না জানিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী অমিতাভ মহারাজের সঙ্গে চলে এলেন এই বাঙ্গলার মুর্শিদাবাদে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য তথা স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের সারগাছি আশ্রমে। ১৯৩৭ সালের মকর সংক্রান্তি তিথিতে গুরু অখণ্ডানন্দজী দীক্ষা দিলেন তাঁকে। দীক্ষা শেষে তিনি মাধবকে বললেন--- 'ঈশ্বরকে পেতে তোমাকে হিমালয়ে যেতে হবে না। মানুষের সেবাই ঈশ্বর আরাধনা। তোমার জন্মস্থান নাগপুরে ফিরে যাও। সেখানে অনেক বড়ো কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।' কিছুদিন পরে গুরু অখণ্ডানন্দজী অমৃতলোকে যাত্রা করলেন। তাঁর নির্দেশ মতো মাধব ফিরে গেলেন নাগপুরে। আগেই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর সঙ্গে, সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। এবার নতুন করে ফিরে এসে মাধব তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সঙ্ঘ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

১৯৪০ সাল। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর স্বর্গবাস হলো। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মাধব অর্থাৎ গুরুজীর কাঁধে দিয়ে গেলেন সঙ্ঘ পরিচালনার ভার। ভারতের ঈশান কোণে তখন সাম্প্রদায়িকতার কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। মুসলিম লিগের ভারত ভেঙে পাকিস্তানের দাবিতে উত্তাল সারা দেশ। মুষ্টিমেয় জাতীয়তাবাদী দেশভক্ত নেতার অক্লান্ত পরিশ্রম বিফলে গেল। ক্ষমতার মোহে মত্ত কংগ্রেস মুসলিম লিগের কাছে নতজানু হয়ে মেনে নিল 'ভারত বিভাগ' প্রস্তাব। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনতার দাবিকে অগ্রাহ্য করে দেশমাতৃকাকে খণ্ডিত করে এল বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দেশভাগের যন্ত্রণায় তখন হিন্দুদের ত্রাহি ত্রাহি রব। পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু, শিখ উদ্বাস্তুদের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছে দেশের আকাশ বাতাস। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মৃতদেহের পাহাড়ে বসে ক্ষমতালোভী নেতাদের তখন চলছে ক্ষমতা ভোগ। এমন কঠিন সময়ে গুরুজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘ সেদিন তার সীমিত শক্তি নিয়ে ঘরছাড়া, স্বজনহারা উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের মাটি থেকে হিন্দু ও শিখদের ভারতের মাটিতে ফিরিয়ে আনা, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজে সঙ্ঘ অগ্রণী ভূমিকা নিল। ফলে

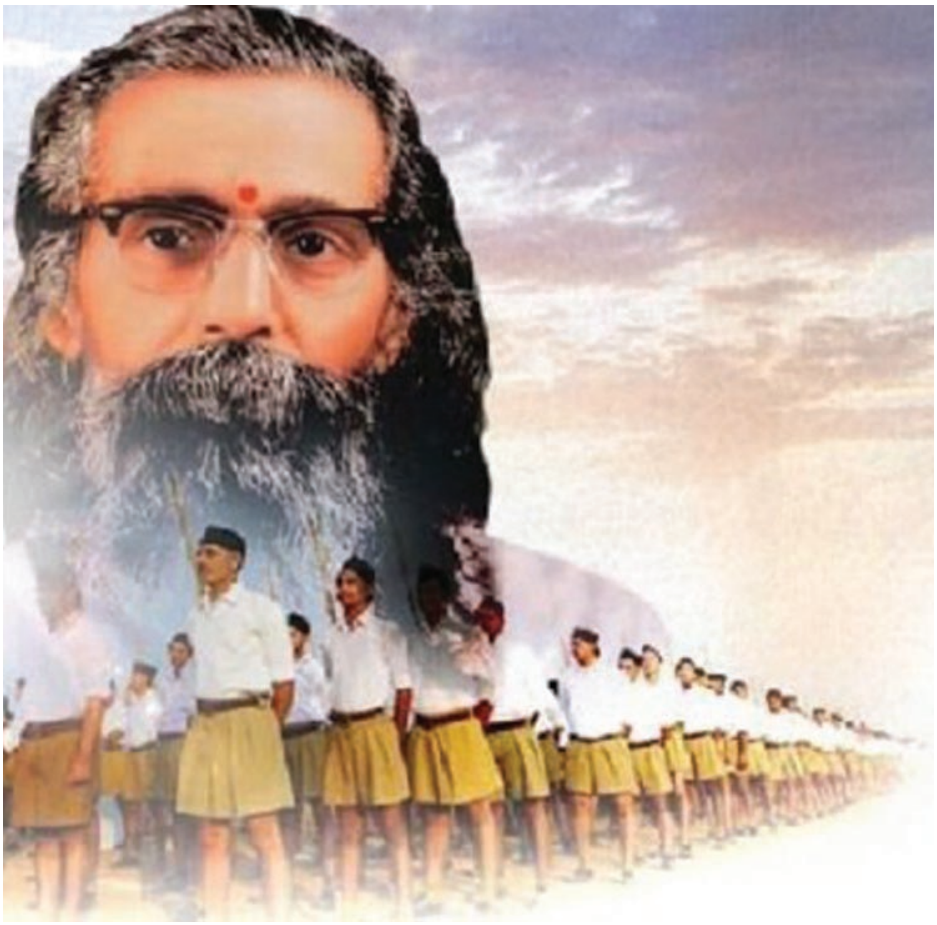

হিন্দু ও শিখরা ধীরে ধীরে সঙ্ঘের প্রতি অনুরক্ত হতে শুরু করল। সঙ্ঘের প্রতি বিশ্বাস বাড়ল মানুষের। এসব দেখে কংগ্রেস চাইল সঙ্ঘ তাদের অনুগত সংগঠন হিসেবে কাজ করুক। গুরুজী বললেন— 'ডাক্তারজীই সঙ্ঘের চলার পথ ঠিক করে দিয়ে গেছেন, সে পথ ব্যক্তি নির্মাণের পথ, রাষ্ট্রসাধনার পথ। রাজনীতি আমরা করব না।' এই উত্তরে নেহরু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং সঙ্ঘকে দমন করার পথ খুঁজতে লাগলেন। ঠিক এমনই সময়ে তাদের এসে গেল এক সুবর্ণ সুযোগ। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। নাথুরাম গডসের গুলিতে প্রাণ হারালেন গান্ধীজী। তার সঙ্গে সঙ্ঘের যোগ আছে এই অজুহাতে সরকার সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করল। স্বয়ংসেবকদের ওপর শুরু হলো শাসকদলের নির্মম অত্যাচার। বহু স্বয়ংসেবককে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো। গুরুজী-সহ বহু কার্যকর্তা জেলে গেলেন। কেটে গেল কয়েক মাস। সুবিচার না পেয়ে গুরুজীর আহ্বানে শুরু হলো সত্যাগ্রহ। হাজার হাজার স্বয়ংসেবকে ভরে উঠল দেশের সমস্ত জেলখানা। এবার প্রমাদ গুনল সরকার। ইতিমধ্যে তদন্ত কমিশনও সঙ্ঘকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছে। নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হলো সরকার। সঙ্ঘের জয় হলো।

কিন্তু এই ঘটনা গুরুজীর মনে এক নতুন চিন্তার জন্ম দিল। তিনি অনুভব করলেন ডাক্তারজীর নির্দেশিত পথে সঙ্ঘের নিত্য শাখায় খেলাধুলা, শরীরচর্চা, নীতিশিক্ষা যেমন চলছে চলুক, তার সঙ্গে সঙ্গে এবার সময় এসেছে শাখার সংস্কারিত স্বয়ংসেবকরা সামনে গিয়ে সঙ্ঘের মতাদর্শ সমাজের সর্বস্তরে বিলিয়ে দিতে পারে তার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সেই ভাবনা থেকে শুরু হলো সঙ্ঘের আদর্শে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগঠনের জয়যাত্রা।

ছাত্রশক্তি হলো আগামীদিনের রাষ্ট্রশক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে এই শক্তিই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, বাঘাযতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মদনলাল ধিংড়া, সুভাষচন্দ্র সকলেই ছাত্রাবস্থাতেই স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে শাসক কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের চক্রান্তে সেই যুবসমাজ ধীরে ধীরে দেশপ্রেমহীন, আত্মকেন্দ্রিক ও রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিতে অনুরক্ত হয়ে উঠল। এতে সচকিত হয়ে উঠলেন গুরুজী। 'আঠারো বছর বয়স'-এর তারুণ্য যদি রাজনীতির দাবার চালে পরিণত হয় তবে দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে? গুরুজীর স্বপ্ন সাকার করতে এগিয়ে এলেন সঙ্ঘের দুই প্রবীণ প্রচারক বেদপ্রকাশ নন্দা ও গিরিরাজ কিশোর। ১৯৪৯ সালে দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা হলো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের, যা আজ ভারতের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন রূপে পরিগণিত।

১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার অভিযোগে সঙ্ঘকে যখন নিষিদ্ধ করা হলো তখন কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সমাজবাদী কোনো দলই সরকারের এই স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। ভারতের পার্লামেন্টে এমন কোনো দল ছিল না যারা সেদিন সঙ্ঘের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। শুধু তাই নয়, দেশ ভাগে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হিন্দুদের আর্তচিৎকারও এদের কানে যায়নি। ঠিক এমনই সময়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু মহাসভা ছাড়লেন। সাক্ষাৎ করলেন গুরুজীর সঙ্গে। শ্যামাপ্রসাদ সঙ্ঘকে আহ্বান জানালেন রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য। গুরুজী বললেন সঙ্ঘ কোনোদিনই রাজনীতিতে যুক্ত হবে না— এ সিদ্ধান্ত ডাক্তারজীর। তবে চাইলে দু'চারজন সংগঠনকুশল কর্মঠ যুবককে তিনি শ্যামাপ্রসাদকে দিতে পারেন যাদের নিয়ে তিনি হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারী একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারবেন। গুরুজীর পরামর্শে শ্যামাপ্রসাদ ১৯৫২ সালে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, কুশাভাউ ঠাকরে, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানী প্রমুখ কয়েকজন তরুণকে নিয়ে গঠন করলেন 'জনসঙ্ঘ'— যা বর্তমানের ভারতীয় জনতা পার্টি। আজ যারা সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে শুধু এদেশে নয় সারা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল।

এদেশে তুর্কি-পাঠান-মুঘল শাসনে এবং ইংরেজ শাসনকালে বহু হিন্দু জনজাতি সম্প্রদায় কেউ-বা ভয়ে আবার কেউ-বা

লোভ- প্রলোভনে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে। স্বাধীনতার পরে পাহাড়, জঙ্গল, উপত্যকায় বাস করা এই পিছিয়ে পড়া জনজাতি সমাজ যাতে তার নিজের স্বধর্মে আস্থা রেখে জীবনযাপন ও সার্বিক উন্নতি করে এগিয়ে যেতে পারে তার দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ শুরু হলো। তারাও আমাদের ভাই-বোন, আত্মীয়, এই বার্তা নিয়ে গুরুজীর পথনির্দেশে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা হলো 'বনবাসী কল্যাণ আশ্রম'— যা আজ ভারতের সর্ববৃহৎ জনজাতি সংগঠন রূপে পরিগণিত। যাদের প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি সেবা প্রকল্প আমাদেরই অবহেলিত অনুন্নত ভাই-বোনেদের সেবায় সতত কাজ করে চলেছে।

সুদীর্ঘকাল বিদেশি শাসনকালের প্রথম খণ্ডে অর্থাৎ বর্বর ইসলামি শাসনকালে তারা আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি— নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীলা, বল্লভী, উজ্জয়িনী, পুষ্পজীবী, সোমপুর প্রভৃতি ভেঙে ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী ১৯০ বছরের ইংরেজ শাসনকালে সুচতুর ইংরেজ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে খ্রিস্টানীকরণের মাধ্যমে এদেশের সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থা, যা নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ওপর দাঁড়িয়েছিল তার সর্বনাশ ঘটিয়েছিল। শিক্ষা মানে কেবল পুথি মুখস্ত করা নয়, এদেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিত, মাতৃভাষা, দেশভক্তি, চরিত্র, শৃঙ্খলাপরায়ণতা— তাকে অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা করা নয়; কিন্তু মেকলে নির্দেশিত ও প্রবর্তিত এদেশের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় তাই হলো। সংস্কৃত ও সংস্কৃতিকে ছুঁড়ে ফেলে এল ইংরেজি ও মিশনারি শিক্ষাব্যবস্থা। শ্রীগুরুজী অনুভব করলেন আরও পরিবর্তন চাই— জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অবহেলা করে নয়। এই লক্ষ্যে তাঁর প্রেরণায় ১৯৫২ সালে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হলো এদেশের প্রথম বেসরকারি দেশীয় শিক্ষা সংস্থা 'বিদ্যাভারতী'। যার মাধ্যমে দেশের কোণে কোণে তৈরি হলো— 'সরস্বতী শিশুমন্দির' বিদ্যালয়। বর্তমানে যার সংখ্যা আজ প্রায় ৩৫ হাজার।

ভারতবর্ষ বিশ্বকর্মার দেশ। শিল্প ও শিল্পী এদেশের ঘরে ঘরে। কিন্তু 'কর্মই যে ধর্ম' —সেই বোধে অনুপ্রাণিত শ্রমিক সংগঠন এদেশে কোথায়? কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে পরিচালিত যে শ্রমিক সংগঠন রয়েছে তারা শুধু 'দিতে হবে, দিতে হবে' অথবা 'ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও' স্লোগানেই বিশ্বাসী। গঠনমূলক শ্রমিক সংগঠন কোথায়? শিল্পীর কাজ তো ভাঙা নয়, গড়া। তাই এদেশে ভারতীয় ভাবধারার শ্রমিক সংগঠনের অভাব অনুভূত হলো। ১৯৬৬ সালে গুরুজীর নির্দেশে সঙ্ঘ প্রচারক দত্তোপন্থ ঠেংড়ীজীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা হলো 'ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ— যাদের মূল ধ্যেয় বাক্য হলো— 'দেশ কে লিয়ে করেঙ্গে কাম, কাম কে লিয়ে পুরা দাম।' এই শ্রমিক সংগঠনও আজ ভারতের সর্ববৃহৎ মজদুর সংগঠন।

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। এই হিন্দুধর্মের মধ্যেই কত মত-পথ- উপাসনা পদ্ধতি যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে তার হিসেব নেই। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব, মঠ-মন্দির-গুরুদ্বার- ভজনমণ্ডলী— কত ভাবেই যে ঈশ্বরকে ডাকার ও পাওয়ার আকুতি কত ধর্মগুরু, সাধু-সন্ত-মহাত্মারা করে চলেছেন তারও ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এঁরা সবাই যে মহান হিন্দু ধর্মেরই অংশীদার, তাদের মনে এই ধারণার বিস্মরণ ঘটেছিল। প্রত্যেকেই ভাবত তাঁর উপাসনা পদ্ধতিই সঠিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, জীবন জীবিকার প্রয়োজনেও বহু ভারতীয় পৃথিবীর বহু দেশে গিয়ে অবস্থান করছে। তারা তাঁদের আত্মপরিচয়, ধর্মবোধ নিয়ে এই অনুভব করলেও, তারা যে সুবিশাল হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত— এই ধারণা তাদের কাছে ছিল না। গুরুজীর কাছে অনেক অনাবাসী ভারতীয় এই নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলেন। অবশেষে তাঁরই প্রেরণায় ১৯৬৪ সালে প্রয়াগে আয়োজিত হলো পৃথিবীর প্রথম হিন্দু সম্মেলন। পৃথিবীর সব দেশে থেকে অনাবাসী হিন্দুরাও যোগ দিলেন তাতে। তাঁদের সকলের সম্মতিক্রমে কর্ণাটক প্রদেশের উডুপীতে ভারতের সব মত-পথের সাধু-সন্ত-মহাত্মা ও শঙ্করাচার্য উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা হলো 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদে'র। রচিত হলো হিন্দু একাত্মতার নতুন মন্ত্র— 'হিন্দুবঃ সোদরা সর্বে, ন হিন্দুর্পতিতো ভবেৎ। মম দীক্ষা হিন্দু রক্ষা, মম মন্ত্রঃ সমানতাঃ'।। আমরা সকলে হিন্দু, ভাই ভাই। পৃথিবীর প্রায় সব হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এল 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'-এর ছাতার তলায়। না, এখানেই শেষ নয়। শ্রীগুরুজীর স্বর্গারোহণের পরেও তাঁরই প্রদর্শিত পথে তৈরি হয়েছে আরও কত নতুন নতুন সংগঠনের— ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ, সেবা ভারতী, সংস্কার ভারতী, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, আরও কত কী!

১৯২৫ সালে ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামে যে ছোট্ট চারাগাছটি রোপণ করেছিলেন ১৯৪০ সালে তাঁর দেহাবসানের পর তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি শ্রীগুরুজী সেই চারাগাছটিকে নিজের শ্রম-নিষ্ঠা ও যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে শাখা-প্রশাখা-নবপল্লব ও ফুলে-ফলে ভরিয়ে তাকে সুবৃহৎ মহীরূহতে পরিণত করেছেন। যার অসংখ্য শাখা সংগঠন শুধু এদেশেই নয় দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে আজ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রায় ৫০টি দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। সঙ্ঘ আজ কেবল ১ ঘণ্টা শাখার মাঠে যুবকদের লাঠিখেলা, কবাডি খেলার সঙ্ঘ নয়। বরং দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ। বহু জাতীয়তাবাদী, দেশভক্ত সংগঠনের সমাহার— বিরাট বিশাল বিশ্বরূপ। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে গুরুজীর ৩৩ বছরের (১৯৪০-১৯৭৩) দূরদর্শী কুশল নেতৃত্ব ও সাধনায়।

১৯৭৩ সালের ৫ জুন গুরুজী অমৃতলোকে যাত্রা করেন। তাঁর দেহান্তের পরে তৎকালীন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ যথার্থই বলেছিলেন— 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীমাধবরাও গোলওয়ালকরের তিরোধানে ভারতমাতা তাঁর এক কৃতী সন্তানকে হারালেন। তিনি তাঁর শ্রীগুরুর আশীর্বাদে অপূর্ব চরিত্রবল, মেধা ও সংগঠন শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। দেশমাতৃকার সেবায় নিজের জীবন তো উৎসর্গ করেছিলেন, অপর সকলকেও ওইরূপ করতে প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁর বিদেহী আত্মা তাঁর শ্রীগুরুচরণে মিলিত হয়ে চিরশান্তি লাভ করুক এই আমার প্রার্থনা।'

(শ্রীগুরুজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

ভারতীয় হওয়াই অগ্রাধিকার, পোশাক নয়

সিতাংশু গুহ

কর্ণাটকের মুশকান খানের পক্ষে মুসলমানদের একাংশ এবং জাতীয়তা বিরোধী শক্তি মাঠে নেমেছে। স্কুল ইউনিফর্মের বিরুদ্ধে এদের জোরালো যুক্তি হচ্ছে, 'পোশাকের স্বাধীনতা থাকতে হবে'। একটি মুসলিম সংগঠন তাঁকে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। প্রায় একই সময়ে (৮ ফেব্রুয়ারি) শ্রীনগর কাশ্মীরের কৃতী ছাত্রী আরুশা পারভেজ দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫০০-র মধ্যে ৪৯৯ পেয়ে প্রথম হয়েছেন, কিন্তু হিজাব না পরায় তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি পেতে হচ্ছে। হিজাব আন্দোলনে যাঁরা 'মাই চয়েস' দাবি করছেন, 'নো হিজাব' বা 'খোলামেলা পোশাক' কেন তাঁদের কাছে 'মাই চয়েস' হবে না। যাঁরা মুশকান খানের পক্ষে মাঠে নেমেছেন, তাঁরা 'মাই চয়েস' আন্দোলনে বা নারী স্বাধীনতার জন্যে আরুশা পারভেজের পক্ষে মাঠে নামবেন না কেন?

ভারতে ইতোপূর্বে কৃষক আন্দোলন হয়েছে। এ সময়ে কর্ণাটকে বোরখা বা হিজাব আন্দোলন হচ্ছে এবং তা কিছুটা এদিক-ওদিক ছড়াচ্ছে। ভারতে প্রায়শ দেখা যায়, মুসলমান সম্প্রদায়ের আন্দোলন ভাত-কাপড়-শিক্ষা বা কর্মসংস্থানের জন্যে নয়, ধর্মীয় প্রথা নিয়েই হয়। বোরখা বা হিজাব আন্দোলনে উৎসাহ জোগানো 'মুশকান খান' ইতিমধ্যে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর অশালীন পোশাকে অসংখ্য ছবি মিডিয়ায় এসেছে। বলা হচ্ছে তিনি জামায়াতে হিন্দ-এর সদস্য ও কাদিয়ানী। পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের 'অ-মুসলমান' ঘোষণার দাবি আছে। পাকিস্তানের নোবেল বিজয়ী আবদুস সালাম কাদিয়ানী হওয়ায় বড়োই অবহেলিত ও বিড়ম্বিত জীবনযাপন করেছেন। সেদিক থেকে দেখলে বাংলাদেশ বা ভারতে বোরখা আন্দোলন খুব জমবে বলে মনে হয়-না।

কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদ খান ইসলাম সম্পর্কে তাঁর উদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালাম সবার নমস্য। তাঁদের কথা শুনলে বা মানলে ধর্ম নিয়ে 'সভ্যতার সংঘাত' অনেকটা কমে যেতো। নেতাজী সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে কোনো মুসলমানকে কথা বলতে শুনিনি। এপিজে আবদুল কালামকে নিয়ে কোনো হিন্দুকে বিরূপ মন্তব্য করতে দেখিনি। তাহলে একথা কি বলা যায় যে, হিন্দু হও তো সুভাষ বসু হও; মুসলমান হও তো এপিজে আবদুল কালাম হও? বড়ো কথা হচ্ছে, সুভাষ বসু বা এপিজে আবদুল কালাম মানুষের মতো মানুষ ছিলেন, 'সবার ওপরে মানুষ সত্য'; হিন্দু-মুসলমান হওয়ার আগে একজন ভালো মানুষ হও, সেটা হলেই কেবলমাত্র একজন ভালো হিন্দু বা ভালো মুসলমান হওয়া সম্ভব?

আরুশা পারভেজ

ভারত-পাকিস্তান নিয়ে উপমহাদেশে তর্কের শেষ নেই। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ তিনি সসম্মানে আমৃত্যু মন্ত্রিত্ব করে গেছেন। একই সময়ে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী ছিলেন যোগেন মণ্ডল, পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তিতে তিনি ব্যাপক সহায়তা করেছিলেন। অথচ মন্ত্রী থাকা অবস্থায় তাঁকে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে কলকাতা গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে। এ দুটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে ভারত-পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মর্যাদা বা অবস্থান বোঝা সহজ হয় বটে। সেই পূর্ববঙ্গ পরে পূর্ব-পাকিস্তান হয়েছে, আরও পরে তা স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে, কিন্তু হিন্দুদের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি, আজও তাঁরা অত্যাচারীর আমানত, নিজদেশে পরবাসী।

ভারতে চারজন মুসলমান রাষ্ট্রপতি হয়েছেন— জাকির হোসেন, ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ, মোহাম্মদ হিয়ায়েতুল্লাহ এবং এপিজে আবদুল কালাম। ভারতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিমান বাহিনী প্রধান এবং অন্য অসংখ্য পদ মুসলমানরা অলংকৃত করেছেন। একদা পশ্চিমবঙ্গের স্পিকার মুসলমান ছিলেন, কলকাতার মেয়র এখন ফিরহাদ হাকিম। বাংলাদেশে সুরেন্দ্র কুমার সিনহা সামান্য সময় প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তিনি দেশছাড়া হয়েছেন। বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রধান বিচারপতি হতে পারতেন; মেজর জেনারেল চিত্ত রঞ্জন দত্ত সেনাপ্রধান হতে পারতেন; এ কে গাঙ্গুলি বাংলাদেশে ব্যাঙ্কের গভর্নর হতে পারতেন অজ্ঞাত কারণে কেউ কিছু হননি! আমাদের তাই উচিত হবে ভারতে মুশকান-আরুশা বিতর্কে হাততালি না দিয়ে নিজের ঘরের দিকে তাকানো। □

ভারতের বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার ইতালিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১২০০ বছরের গৌতমবুদ্ধের মূর্তিটি ছিল বিহারের কুরকিহারে দেবীস্থান কুন্দালপুর মন্দিরে। ২০০০ সালে স্মাগলিং করা হয় বুদ্ধমূর্তিটি ইতালিতে। সম্প্রতি এটি উদ্ধার হয়েছে সেখান থেকে। অষ্টম-নবম শতকের তৈরি এই বোধিসত্ত্বের স্কাল্পচারটি চুরি হয়ে যায় দেবীস্থান কুণ্ডলপুর মন্দির থেকে। বহু বছর ধরে তল্লাশি চালানোর পর সিঙ্গাপুর ইন্ডিয়া প্রাইড প্রোজেক্ট এবং আর্ট রিকভারি ইন্টারন্যাশনাল এটি উদ্ধার করে ইতালি থেকে। পাথরের তৈরি এই মূর্তিটি বোধিসত্ত্বের এক রূপ অবলোকিতশ্বর পদ্মপাণি-র। গত ১১ জানুয়ারি ইতালির মিলানস্থিত ভারতীয় বাণিজ্য দূতাবাস আধিকারিকদের হাতে মূর্তিটি তুলে দেওয়া হয়েছে।

নবম থেকে দ্বাদশ শতকে গয়ার কাছে অবস্থিত কুরকিহার একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। বহু প্রাচীন পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তী সময় আন্তর্জাতিক কালো বাজারিতে বহুমূল্যের এই মূর্তিগুলির চাহিদা বাড়ে এবং ভারত থেকে এগুলি পাচার হতে থাকে। এর আগে ২০২১-এর ডিসেম্বর বিদেশ থেকে উদ্ধার হয়েছে অষ্টম শতকের ছাগী মস্তক বিশিষ্ট যোগিনীর অমূল্য মূর্তি। উদ্ধার হওয়া বুদ্ধ মূর্তিটি দু'মাসের মধ্যে ভারতের দ্বিতীয় সাফল্য।

নিরাপত্তার ইস্যুতে ভারত নিষিদ্ধ করল ৫৪টি চীনা অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত সরকার ৫৪টি চীনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে যেগুলির সঙ্গে চীনের লিঙ্ক রয়েছে এবং দেশের নিরাপত্তার পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুগল তার স্টোর থেকে এই অ্যাপগুলিতে অস্থায়ীভাবে অ্যাক্সেস ব্লক করেছে। যদিও ভারত সরকার ২০২০ সাল থেকে চীনা অ্যাপ ব্লক করার কর্মসূচি নিয়েছে। নতুন পদক্ষেপটি তারই ধারাবাহিকতায়।

সরকার এর আগে টিকটক ও পাবজি অ্যাপগুলিকে মোবাইল-সহ নিষিদ্ধ করেছিল। এখন যে অ্যাপগুলি নিষিদ্ধ হবে তার মধ্যে রয়েছে Tencent's Xriver ও গেমিং ফার্ম NetEase-এর Onmoji Arena। ২০২০ সালের মে মাসে চীনের সঙ্গে সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধির পর থেকে সরকার দেশে প্রায় ৩০০টি অ্যাপ ব্লক করেছে। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক (Meity) গুগল ও অ্যাপলকে অ্যাপগুলিতে অ্যাক্সেস ব্লক করার নির্দেশ দিয়েছে।

একজন গুগল মুখপাত্র বলেছেন, 'আইটি আইনের ধারা 64A-এর অধীনে অন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রাপ্তির পরে, প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, আমরা প্রভাবিত ডেভেলপারদের জানিয়েছি এবং সাময়িকভাবে ভারতে প্লে স্টোরে উপলব্ধ অ্যাপগুলিতে অ্যাক্সেস বন্ধ করে দিয়েছি'।

ইসরোর মুকুটে নতুন পালক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০২২-এর মহাকাশ অভিযানের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করল ইসরো। ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ৫-৫৯ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে পিএসএলভি রকেটের মাধ্যমে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা কৃত্রিম উপগ্রহটির (ইওএস-৪) সফল উৎক্ষেপণ করা হয়।

আর্থ অবজার্ভিং স্যাটেলাইট (ইওএস-৪) ছাড়াও একই সঙ্গে দুটি কো-প্যাসেঞ্জার পে-লোড, ইন্সপায়ার স্যাট-১ এবং একটি টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেটার স্যাটেলাইট আইএনএস-২ টিডি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে পিএসএলভি রকেটের মাধ্যমে।

উৎক্ষেপণের ১৮ মিনিটের মাথায় ১৭১০ কিলোগ্রামের ইওএস-০৪-কে ৫২৯ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে পিএসএলভি রকেট। একই সঙ্গে অন্য দুটি কৃত্রিম উপগ্রহও সফলভাবে কক্ষপথে পৌঁছে যায়। ইসরোর প্রধান এস সোমনাথ জানিয়েছেন, 'পিএসএলভি-সি-৫২ মিশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ইওএস-০৪, সবরকম আবহাওয়ায় উচ্চ গুণসম্পন্ন দ্বিমাত্রিক ছবি তুলতে সক্ষম। ভারতের কৃষি, বনবিভাগ বৃক্ষরোপণ, মাটির গুণাগুণ, আর্দ্রতা, জলবিদ্যা ও বন্যা পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য নিখুঁত ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে ইওএস-০৪। এক দশক ধরে তথ্য বিশ্লেষণের কাজ করতে সক্ষম ইওএস-০৪।

৮.১ কিলোগ্রামের ইন্সপায়ার স্যাট-১ কৃত্রিম উপগ্রহটি তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং আমেরিকার কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি অব অ্যাটমসফরিক অ্যান্ড স্পেস ফিজিক্সের যৌথ উদ্যোগে। একবছর ধরে সূর্যের তাপ প্রবাহের প্রক্রিয়া এবং আয়োনোস্ফিয়ার সংক্রান্ত তথ্যের খুঁটিনাটি জানা যাবে এই কৃত্রিম উপগ্রহটির মাধ্যমে।

ইসরোর মিশন ২০২২-এর

প্রথম সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'পিএসএলভি-সি-৫২ মিশনের সফল উৎক্ষেপণে ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের আমার শুভেচ্ছা রইল। ইওএস-০৪ স্যাটেলাইট ভারতের ভৌগোলিক ক্ষেত্র, কৃষি, মাটির আর্দ্রতা ও জলবিজ্ঞান বিষয়ক হাই রেজুলেশন দ্বিমাত্রিক চিত্র পাঠাতে সক্ষম। এর ফলে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারত আরও উন্নতি করবে।'

রাহুলের বিরুদ্ধে হাজার মামলা আনলো বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং দেশদ্রোহিতা মামলা করল। প্রায় এক হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে রাহুলের

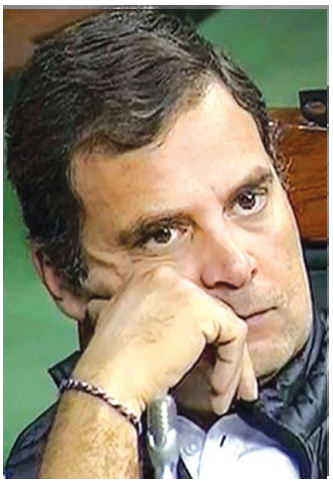

বিরুদ্ধে। অনবরত কিছু ভুল কথা বলে ফেলা কংগ্রেস লিডার রাহুল গান্ধী আবারও একটি ভুল মন্তব্য করে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। সম্প্রতি রাহুল টুইটে বলেছেন 'গুজরাট থেকে পশ্চিমবঙ্গেই ভারতের অবস্থান।' এই মন্তব্যের একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে রাজনৈতিক মহল তথা আম জনতার মধ্যে। সরকারে থাকা রাজনৈতিক পার্টি এইবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রাহুলের এই ধরনের ব্যবহার আর বরদাস্ত করা হবে না। প্রায় এক হাজারটি মামলা ফাইল করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি অসমে। কংগ্রেস এমপি রাহুল গান্ধীর বিতর্কিত টুইট পরোক্ষে সমর্থন করছে চীনের দাবিকে। যে দাবিতে চীন অরুণাচলপ্রদেশকে নিজের সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে।

কেরলের এমপি ১০ ফেব্রুয়ারি একটি টুইটের মাধ্যমে বলেন ভারতবর্ষ বিবিধের মাঝে ঐক্য। এখানে আমরা পাই— বৈচিত্রের মাঝে ঐক্যের মিলন, ভাষার মিলন, সংস্কৃতির মিলন, মানুষের মিলন। রাহুল গান্ধী ওই একই টুইটে আবার বলেন যে এই ঐক্যের মিলন শুধু গুজরাট থেকে পশ্চিমবঙ্গে এবং কাশ্মীর থেকে কেরলে, সকল রঙের বৈচিত্র্য ভারতবর্ষ সুন্দর, এর অন্যথা বলে ভারতের আত্মাকে অপমান করবেন না।'

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২৪।।

ডাক্তারজীর সেবায় দিনরাত এক করে ফেললেন গুরুজী। আহার-নিদ্রার সময়ও পেতেন না। কিন্তু ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সব চিঠির উত্তর দিতেন।

সুস্থ হয়ে ওঠার পর নাসিকে ডাক্তারজীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হলো। গুরুজী সব বিষয়ে নজর রাখতেন।

ডাক্তারজী ঘন ডাল খুব পছন্দ করেন।

একদিন স্বয়ংসেবকরা নিজের মধ্যে কথা বলছিলেন—

সোমবারে আমার উপবাস।

আমার মঙ্গরবারে।

আমার কোনো 'বার' নেই। শুধু হেডগেওয়ার আছেন।

গুরুজী এইভাবে ডাক্তারজীর সেবায় নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালে রাখি বন্ধনের দিন ডাক্তারজী ঘোষণা করলেন—

আজ থেকে অধ্যাপক গোলওয়ালকর সঙ্ঘের সরকার্যবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

চলবে